সান ইয়াৎ সেন

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

বার আনা

বর্দ্ধণ পাবলিশিং হাউস
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৫

প্রকাশক—শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মণ,
বর্ম্মণ পাব্‌লিশিং হাউস
১৯৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ



স্বর্গীয় পিতৃদেবতার
পবিত্র স্মৃতির
মন্দিরে

প্রিন্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌;
১৫নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

অবতরণিকা

চীন দেশের বিপ্লবময় অবস্থার কথা বলিতে গেলে স্বতঃই চীনের অতীতের কাহিনীর কথা মনে পড়ে। কি ভাবে পরপদানত চীন জাতি ধীরে ধীরে মাঞ্চু সাম্রাজ্যের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া জগতে একটা বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হইয়াছে, কি ভাবে বৈদেশিক শক্তির অনুপ্রেরণায় নবজাগরিত চীন আজ নিজেদের মধ্যে বিপ্লবের বহ্নি জ্বালাইয়াছে—তাহা সত্যই কৌতূহলপূর্ণ। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা সমস্ত খবর সঠিক পাই না—তাই, ভারতের অতি সন্নিকটে যে এত বড় একটা বিপ্লব সংঘটিত হইয়া যাইতেছে, তাহা আমাদের শুধু আবছায়ার মত মনে পড়ে। চীনের অতীত অজ্ঞানতা হইতে উত্থান ও তার বর্ত্তমান অবস্থার সহিত প্রধানতঃ যিনি জড়িত তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক আমরা বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করিব।

পৃথিবীতে বর্ত্তমান যুগে যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি জগতের কার্য্যে বিখ্যাত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সানইয়াত সেন অন্যতম। চীনের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, চীন জাতির নবযুগের প্রবর্ত্তক সানইয়াত সেন শৈশব

হইতে অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু কোথা হইতে যে সাধনার সিদ্ধি হয়, কোথা হইতে যে কৃতকার্য্যতার প্রতি-মূর্ত্তি ফুটিয়া ওঠে বুদ্ধিহীন মানব তাহা ধারণা করিতে পারে না। তাই, শৈশবকালে কে ভাবিয়াছিল যে, এই ক্ষুদ্র বালক একদিন চীন দেশের প্রবল পরাক্রান্ত মাঞ্চু সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করিয়া চীনগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবে! কে ভাবিয়াছিল যে, এই ক্ষুদ্র বালকের অপূর্ব্ব ধীর গম্ভীর বাণী একদিন জাপান, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে প্রতিধ্বনিত হইবে! কে ভাবিয়াছিল, চীনের সাম্রাজ্য শাসনের অন্ধকারময়যুগ তিরোহিত হইয়া এক আলোকরশ্মি আসিয়া চীন জাতিকে গভীর নিদ্রা হইতে উত্থিত করিবে!

সত্য সত্যই চীন জাতির নিকটে এবং জগতের সমক্ষে ইহা বিচিত্র বলিয়াই বোধ হয়। কেননা ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কোন চীন দেশবাসী ইহা স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, এই প্রতিপত্তিশালী স্বর্গের দেবতাস্বরূপ মাঞ্চু সম্রাটের প্রবল হস্ত হইতে রাজ্যের শাসন দণ্ড স্খলিত হইয়া দীন হীন প্রজাতন্ত্রের দুর্ব্বল মস্তকে আসিয়া পড়িবে! একটা আকস্মিক ঘটনার ন্যায় চীন দেশে সিংচুং সমিতির প্রতিষ্ঠা হইল, একটা প্রবল বাত্যায় মাঞ্চু সম্রাট পুরাতন সিংহাসন হইতে নামিয়া গেলেন!

গভীর অজ্ঞানতার মধ্য হইতে চীন জাতি আলোক দর্শন করিয়াছে! যে চীন শত শত বৎসর অত্যাচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, বাহিরের জগতের সহিত যার বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না, যে জাতির জগতের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে জ্ঞান আহরণের কোন অধিকার ছিল না, নিজের দেশের কথা যে জাতি ভাবিতেও পারিত না, সে জাতি কি করিয়া মাত্র তিরিশ বৎসরে রাজতন্ত্রের শৃঙ্খল দূরে ফেলিয়া মুক্ত হইয়া দাঁড়াইল? যখন ভগবানের কৃপায় চীন জাতি এই ভাবে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিল তখন সে দেখিতে পাইল, তখন সে সত্যই বুঝিতে পারিল যে সে কত অসহায়, সে কত অক্ষম! নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইবার তার শক্তি নাই। তাই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর তার পদে পদে অক্ষমতা, কর্ম্মে অকুশলতা, অজ্ঞানতা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাই, প্রথমে যখন রাজার কঠোর শাসন হইতে মুক্ত হইবার প্রয়োজন হইয়াছিল—সানইয়াত সেনের নেতৃত্বেই তাহা অতি সত্বর চীনজাতি পাইয়াছিল।—আবার যখন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর দেশে কু-শাসনের ফলস্বরূপ চারিদিকে অশান্তি বাড়িয়া উঠিল—তখন এই সান ইয়াত সেনই দেশকে সে অশান্তি হইতে রক্ষা করিলেন। পুনরায় বর্ত্তমানে যখন দেশ বিদেশীয় জাতির ক্রুর

দৃষ্টিপথে পতিত হইল, যখন দেশের সন্তান বিদেশীয়ের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া দেশের অনিষ্ট সাধনে তৎপর হইলেন, তখন এই মহৎ ব্যক্তিই অগ্রসর হইয়া সেই অরাজকতার প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। এমনি ভাবে সুখে দুঃখে দেশের সুখ দুঃখের সহিত বিজড়িত হইয়া সানের কর্ম্মময় জীবন কাটিয়া গিয়াছে। জীবনে তিনি দেশের ও মানবের কার্য্য করিতেই আসিয়াছিলেন, জীবন ভরিয়া সেই সাধনাই করিয়া গেলেন।

যখন ক্ষুদ্র চারা গাছটী উঠে, তখন কেহ তাহাকে লক্ষ্য করে না, কিন্তু যখন সেই ক্ষুদ্র অঙ্কুর একদিন বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়া সকলকে সুশীতল ছায়া প্রদান করে, তখন সকলেই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াথাকে। সান যখন ছোট ছিলেন তখন হইতে তাঁর ধীর গম্ভীর তেজস্বিতা, ও কর্ম্ম কুশলতা একজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল,—ইনি ছিলেন সানের গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক। সান তখন সেই স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। সানের জন্মের কিছুদিন পূর্ব্বে চীন অধিবাসীরা মাঞ্চু সম্রাটের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া চীনদেশের দক্ষিণ ভাগ হইতে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। ইতিহাসে ইহার নাম টেপিং বিদ্রোহ ;—পনর বৎসর যাবৎ বিদ্রোহীরা দক্ষিণ চীনে প্রতিষ্টিত থাকিয়া মাঞ্চু সম্রাটকে

হেয় জ্ঞান করিয়া দেশ শাসন করিয়াছিল। সানের এই শিক্ষক মহাশয় সেই বিদ্রোহের একজন কর্ম্মী ছিলেন। যখন মাঞ্চু সম্রাটের সৈন্যদল নানকিন অধিকার করিয়া ফেলিল, তখন তিনি তথা হইতে পলায়ন করিয়া পল্লীগ্রামে শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। সানের জন্মভূমি ক্যাণ্টন জেলায় সিয়ার-সোল নামক স্থানে তিনি স্কুল খুলিলেন। এইখানে বালক সানের বুদ্ধিপ্রাখর্য্য দর্শন করিয়া তিনি দেশ জাতি ও দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর নিজের মতামতগুলি গল্পচ্ছলে সানকে শুনাইতেন। কি করিয়া বিদেশী মাঞ্চু রাজা ধীরে ধীরে চীন দেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলিল, কি করিয়া মাঞ্চু রাজারা চীনাদের অত্যাচার করিতেন, এবং কি করিয়া চীনাজাতি অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া টেপিং বিদ্রোহ উপস্থাপিত করিল,—এ সমস্ত তিনি একে একে বালক সানের কাছে বলিয়া যাইতেন। সান একাগ্রচিত্তে দেশের এই অধঃপতনের কাহিনী শুনিতেন। তারপরে যখন শুনিতেন যে, মাঞ্চু রাজা কি করিয়া সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া টেপিং বিদ্রোহ দমন করিলেন,—তখন সানের ইচ্ছা হইত তিনিও ঐ রকম একটা কিছু করিয়া বসেন। ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র বালকের কোমল মনে স্বাধীনতার, স্বজাতিপ্রিয়-তার একটা মহনীয় আদর্শ অঙ্কিত হইয়া গেল। তিনি সেই

টেপিং বিদ্রোহীর এই অপূর্ব্ব আদর্শে শৈশব হইতে অনুপ্রাণিত হইয়া রহিলেন—পরবর্ত্তী জীবনে তিনি সে আদর্শ পরিত্যাগ করেন নাই।

সানইয়াত সেনের শৈশব জীবন এইরূপ শিক্ষার মধ্য দিয়া কাটিয়াছিল। যৌবনে হংকং ও ক্যান্‌টনে ডাক্তারী পড়িবার সময়ে তিনি আর একটি শিক্ষক পাইয়াছিলেন। ইনি হংকং মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ (Dean) ইংরেজ ডাক্তার জেম্‌স্ ক্যান্‌টাইল। ইহার ন্যায় সাধু চরিত্রের ব্যক্তির সঙ্গ পাইয়াছিলেন বলিয়া সানইয়াতসেন পরম উপকৃত হইয়াছিলেন। সানইয়াত দেশের তাৎকালিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর নাকি কেহ চীনদেশে ডাক্তারি পাশ করেন নাই। তিনিই প্রথম। কিছুদিন প্র্যাক্‌টিস্ করিবার পর তিনি তাহা ছাড়িয়া দিলেন। দেশের ডাকে তিনি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন—তখন মাঞ্চু রাজার অত্যাচার চরমে উঠিয়াছে। এই সময়ে 'নবীন চীন' সমিতির স্থাপনা হইয়া গেল। ইহার চীনে নাম 'সিনচুং লিগ'। সানইয়াতের উত্তোগে অতি দ্রুত এই সমিতির কার্য্য বাড়িয়া চলিল। চীন দেশের ভিতরে ক্রমে ক্রমে যে স্থানের লোক তাহাদের গ্রাম ও তাহার পাশের গ্রামের খবর ছাড়া যে বাহিরে একটা জগৎ পড়িয়া

রহিয়াছে তাহার সংবাদ জানে না—সেইসব স্থানে তিনি এই সমিতির উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কখনো হাঁটিয়া, কখনো নৌকায় তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। অবিলম্বে এই সাধনার ফসলও ফলিল। দলে দলে লোক আসিয়া এই সমিতিতে যোগ দান করিল। চীন দেশের বাহিরে যে শত শত চীন প্রজা পরের বোঝা বহিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া রহিয়াছে—সানইয়াত তাহাদেরও ডাকিলেন। সংবাদ পত্র সম্পাদন করিয়া ও নানা প্রকার পুস্তক ছাপাইয়া দূরদেশে প্রচার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই নবীন সমিতির অক্লান্ত চেষ্টায় দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে একটা নবীন ভাব জাগিয়া উঠিল।

এই সময়ে সান দেখিলেন যে, এইরূপ প্রচার কার্য্যদ্বারা বর্ত্তমানের উপযোগী মানুষ ত তৈয়ার হইল,—কিন্তু ভবিষ্যতের জন্যও লোক প্রস্তুত করিতে হইবে,—যাদের উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমানের কার্য্যের ভবিষ্যৎ সফলতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া রহিবে। তাই, তিনি বুদ্ধিমান যুবকদিগকে আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী প্রভৃতি স্থানে নানা বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, যদিওবা দেশ বর্ত্তমানের

চেষ্টায় স্বাধীন হয় কিন্তু তার অর্থ নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা না করিলে চলিবে না। তাই, এই সমস্ত যুবকদিগকে এমন সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন, যাহাতে দেশে একটা স্থায়ী উন্নতির সোপান প্রস্তুত হয়। তারপরে তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, স্বাধীন হইলেই বাহির হইতে নানা প্রকার শত্রু আসিয়া গণতন্ত্রের কার্য্যকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। সে সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মস্তিষ্ক না হইলে বাহিরের পাশ্চাত্য-শক্তিকে কেহ বাধা দিতে সমর্থ হইবে না। বর্ত্তমানে হইয়াছেও তাই। চীন দেশে আজ কাল যে আন্তর্জাতিক বিপ্লব সূচিত হইয়াছে—তাহা সেই পাশ্চাত্য জাতিনিচয়ের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের তীব্র অভিলাষ —নবীন গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিবার-বিপুল চেষ্টা!

এইরূপে চারিদিক আয়োজন পূর্ণ করিয়া সানইয়াত মাঞ্চু রাজার সহিত যুদ্ধে নামিলেন। কিন্তু প্রতি বারই হয় অস্ত্র শস্ত্রের গোলাবারুদের অভাবে, আর না হয় সৈন্যের অভাবে পরাস্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন না। এই ভাবে বহু বৎসর চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া অগত্যা সান স্বদেশ হইতে দূরে সরিয়া পড়িলেন। মাঞ্চু রাজা তাঁর মাথার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। সান বিদেশে চলিয়াগেলেন

কিন্তু দেশের কাজ পড়িয়া রহিল না। তিনি স্বদেশে যে সমস্ত মানুষ নিজের হাতে গড়িয়া তুলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারাই তাঁহার অসম্পূর্ণ কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। অবশেষে ১৯১১ সালে বিদ্রোহীদিগের শেষ চেষ্টা সফল হইল। পরাস্ত হইয়া মাঞ্চু সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। সানের আশা পূর্ণ হইল। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরিক শান্তির প্রতিষ্ঠা তিনি করিয়া যাইতে পারিলেন না। অসমাপ্ত কার্য্য পশ্চাতে রাখিয়া তাঁহাকে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইল।



সান-ইয়াৎ-সেন ও তাঁহার পত্নী

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা। ৪৫৩।২৫

সান ইয়াৎ সেন

(১)

সে কি আজিকার কথা! যখন অন্য সকল দেশে লোকেরা বনে বনে গাছে গাছে ঘুরিয়া বেড়াইত, পাহাড়ের গায় গুহার ভিতরে শুইয়া থাকিত, পশু-পাখীর কাঁচা মাংস আগুনে ঝলাইয়া খাইয়া বাঁচিত, তখন চীনদেশের লোকেরা কি না করিয়াছে! তারা তখন বড় বড় ইমারত গড়িয়াছে, খাল কাটিয়া, নৌকা তৈয়ার করিয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। আজ নিত্য নূতন ছাপার হরপে বড় বড় বই আমরা পড়ি,—কিন্তু চীনদেশের লোকের মগজেই সকলের আগে ছাপাখানার কৌশল বাহির হয়। সেই কত হাজার বছর আগে তাহারা বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করিয়াছে, নানারকম রং বেরংয়ের মাটীর পুতুল তৈয়ার করিয়াছে—তখন চীনদেশের নাম ছিল কত!

আমরা জানিতাম যে চীনদেশের লোকেরা লম্বা লম্বা টিকি রাখে, আফিং খাইয়া নেশা করিয়া পড়িয়া থাকে, আর

কেহ বলিল—লিজি চিং কে? উহাকে রাজগদী হইতে নামাইয়া দাও। সে সময়ে ভূতপূর্ব্ব মিং-রাজার একজন সেনাপতি সীমান্তে কাজ করিতেছিলেন—তাঁর নাম উ-সান-কাই। তিনি ভাবিলেন—এই ভারি সুবিধা। তিনি গোপনে গোপনে মাঞ্চুদের ডাক দিলেন—লিজি-চিংকে সিংহাসন হইতে বরখাস্ত করিতে। মাঞ্চুরা জাতিতে তাতার। চীনরাজ্যের গায়ে লাগা ছিল তাহাদের রাজ্য।

দুই দলে যুদ্ধ হইল। উঃ সে কি যুদ্ধ! সাত বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধই চলিল। তারপর মাঞ্চুরাজা দেশ জয় করিয়া সিংহাসনে বসিলেন। লিজি-চিং আর উ-সান-কাই কাহারও কোনও লাভ হইল না—তাঁহারা কপাল চাপড়াইয়া মরিলেন।

এমনি করিয়া মিং বংশের পর আসিল মাঞ্চুর দল। সেই দিন হইতে চীনেরা তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিল—সে আজ নয় শত বছরের কথা।

মাঞ্চু রাজা চীনের রাজগদীতে বসিয়া নিশ্চিন্তে রাজত্ব করিতে পারিলেন না। আজ এ বিদ্রোহ করে—কাল ও বিদ্রোহ করে—মাঞ্চুরা অস্থির হইয়া উঠিল। শেষে আর না পারিয়া মাঞ্চুরাজা মরিয়া হইয়া উঠিলেন।

গরীব চীনদের বাড়ী-ঘর ভাঙ্গিয়া সেই খানে প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড দুর্গ তৈয়ার করা হইল। সেই সব দুর্গের চিহ্ন আজও দেখা যায়। সেই সব দুর্গের ভিতরে বাহিরে দিন-রাত্র মাঞ্চু সৈন্য খোলা অস্ত্র হাতে লইয়া ঘুরিত ফিরিত। ভয় পাইয়া চীনেরা সরিয়া গেল।

এতগুলি সৈন্যের খোরাক-পোষাকের বরাদ্দ করিতে, আর বড় বড় দুর্গ আর যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম তৈয়ার করিতে রাজার ভাণ্ডার ফুরাইল। এ অবস্থায় সকল দেশেই যা হয়, তাহাই হইল, গরীব প্রজাদের উপর নূতন নূতন কর বসিল।

মাঞ্চুরাজাদের প্রথম কয়েকজন বেশ জবরদস্ত রাজা ছিলেন—তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না যে, চীনদেশে চীনাদের আদব-কায়দা পুরাণো আচার-ব্যবহারের উপর কখনো হাত দেন। তাঁহারা যেমন কঠিন হাতে শাসন করিতে জানিতেন, তেমনি দরকার পড়িলে কোমল হাতে চীনাদের গায়ে হাত বুলাইয়াও দিতে জানিতেন। কিন্তু পরে যে সব রাজা সিংহাসনে বসিলেন,—তাঁহাদের কেহই আর তেমনটি হইলেন না। তাঁহারা দেশের শাসনকর্ত্তাদের উপর সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিলেন। এই সব শাসনকর্ত্তাদের বলিত মন্দারিন। এঁদের কাজে কেউ কোন দিন হাত দিত না। সুতরাং শাসনকর্ত্তারা শাসনের নামে প্রজাদের শোষণ

করিতে কসুর করিতেন না। রাজারাও হইলেন তেমনি। তাঁহাদের প্রাসাদেই রাজত্ব, অন্তঃপুরেই রাজধানী। রাজ-প্রাসাদের ভিতরটা বাহিরের লোকে কোনদিন দেখিতে পাইত না। প্রাসাদের চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীর। একটা দুইটা নয়—পর পর তিনটা। এই তিনটা প্রাচীরের দেউড়ী পার হইলে তবে সেই 'স্বর্গপুরীতে' পৌছান যাইত। রাজা সেই মণি কোটা হইতে সংবৎসরে একবারও বাহিরে আসিতেন কিনা সন্দেহ। প্রাসাদের ভিতরেই সব,—মায় শিকার করিবার বন-জঙ্গল পর্য্যন্ত। রাজা যদি কোনদিন সেই স্বর্গ হইতে বাহির হইতেন তবে রাজ্য মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। হুকুম ছিল বড় মজার,—কেহ রাজার মুখের দিকে চাহিতে পারিবে না—দূর হইতে রাজা আসি-তেছেন দেখিতে পাইলে সাষ্টাঙ্গে উপুড় হইয়া প্রণাম করিবে, এবং সাত-সাত বার ধূলায় লুটাইবে।

দেখিয়া শুনিয়া প্রজারা তিক্ত-বিরক্ত হইয়া গেল। সবার মুখে এক কথা—"ফাং-শিং ফু-মিং" অর্থাৎ মাঞ্চুদের তাড়াও, মিং-রাজাকে ডাকিয়া আন।

ধীরে ধীরে সময় বহিয়া যাইতে লাগিল—আর বছরের পর বছর মাঞ্চুদের অত্যাচার বাড়িয়াই চলিল।

(২)

মাঞ্চু সম্রাটের আদেশে চীনাদের বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হইয়া গেল। সম্রাট দেখিলেন যে, চীনারা যদি লেখা পড়া শিখিয়া বিদ্বান হইয়া মানুষ হইয়া উঠে, তবে আর রক্ষা নাই। তাই দেশের আইন-কানুন তাহাদের পড়িতে দেওয়া হইত না,—বড় বড় শাসনকর্ত্তারাই কেবল উহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন। এই রকম অজ্ঞানতার তমসায় পড়িয়া রহিয়া আরও কত নূতন নূতন অত্যাচারের চাপে চীন প্রজার চোখের জল ঝরিয়া পড়িত!

শেষে সত্যসত্যই একদিন ভগবানের আসন নড়িল। নিরুপায় চীনারা মরিয়া হইয়া উঠিল। দক্ষিণ চীনদেশে এক বিরাট্ বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। চীনদেশের ইতিহাস পড়িলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, একচ্ছত্র সম্রাটের অধীনে সমস্ত দেশটা খুব অল্পদিনই একত্র রাজশাসন মানিয়া লইয়াছে। আজ এদেশ রাজবিদ্রোহ করে, কাল ও দেশের শাসনকর্ত্তা খাজনা বন্ধ করে,—এমনি গোলমালেই চীন

সম্রাটেরা চীনদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। আগাগোড়া দক্ষিণ চীনদেশ অতি অল্প দিনই চীন সম্রাটের অধীনে মাথা নীচু করিয়াছে, আর আজও এই অত্যাচারের বিপক্ষে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল—সেই দক্ষিণ চীন। তারা দেশের পর দেশ বিধ্বস্ত করিল, নগরের পর নগর তাহাদের হাতে চলিয়া আসিল,—সম্রাটের সৈন্য শুধু পরাস্ত হইয়া মাথা নত করিয়া পলাইতে লাগিল। বিদ্রোহীরা দক্ষিণ চীন হইতে মাঞ্চু রাজার রাজত্ব লোপ করিয়া দিল। নানকিন হইল তাহাদের রাজধানী। তারা সিংহবিক্রমে দেশ শাসন করিতে লাগিল। মাঞ্চু রাজা অনেক কষ্টে তাহাদের সঙ্গে আপোষ করিলেন। এই বিদ্রোহের নাম টেপিং বিদ্রোহ।

একে একে দীর্ঘ বারোটি বছর কালের সাগরে ডুবিয়া গেল। এই বারো বছর ধরিয়া বিদ্রোহীরা মাঞ্চু রাজার সাম্‌না-সাম্‌নি বুক উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—দুর্ব্বল চীনসম্রাট্ সেই বিক্রম দেখিয়া মনে মনে চমকিয়া উঠিলেন। বিদ্রোহীদের রাজা ছিল না,—রাণী ছিল না,—তারা নিজেরা সবাই মিলিয়া মিশিয়া দেশ শাসন করিত। অদূর ভবিষ্যতে গোটা দেশটাকেই এই ভাবে শাসন করিতে হইবে বলিয়া বুঝি ভগবান তাহাদিগকে এই রকম করিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

ইউরোপের রাজারা বা প্রজারা চিরকালই পরের সুখ দেখিলে কষ্ট পাইয়া থাকেন। পরের ঐশ্বর্য্য দেখিলে তাঁহাদের বুক ফাটিয়া যায়। তাই পরের ধন লুটিয়া লইতে, পরের রাজ্যে রাজত্ব করিতে, নিজের ধর্ম্ম, নিজের ভাষা, পরকে জোর করিয়া শিখাইতে তাঁরা বরাবরই চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই। ভারতে ও আফ্রিকায় ইংরেজ, আলজিরিয়ায় ফরাসী, দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেন এই ভাবে নিজেদের কীর্ত্তির নিশানগুলি জোর করিয়া বসাইয়া গিয়াছেন। চীনদেশের সম্বন্ধেও সেইরকম আয়োজনের কোনও ত্রুটি রহিল না। অবাধে বাণিজ্য করিতে ইংরেজেরা সম্রাট্ তা-ও কুয়াংএর কাছে আবেদন করিলেন, সম্রাট্ ইংরেজ দূতকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিলেন। ইংরেজেরা তবু হাল ছাড়িলেন না, অনেক প্রকার অনুনয় বিনয় করিয়া বন্ধুভাবে আপোষ করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন প্রার্থনাই গ্রাহ্য করা হইল না। অবাধে বাণিজ্য করিবার অধিকার ইংরেজ পাইলেন না। চীনসম্রাট্ 'বিদেশী বর্ব্বরদিগকে' তাড়াইয়া দিয়া মনের সুখে নিদ্রা গেলেন। কিন্তু চীন উপসাগরের উপকূলে পুনরায় কামানের গর্জ্জন শোনা গেল। সম্রাটের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

দুই শত বৎসরের ঘুম, সে কি সহজে ভাঙ্গে! এই

দুই শত বৎসরের মধ্যে চীনদেশ বিদেশীর মুখ দেখে নাই। ভীত সন্ত্রস্ত চীনসম্রাট্ ইংরেজের গোলার ঘায়ে পিছু হটিলেন। তাঁর দুর্গ মাটিতে গুড়া হইয়া ধূলায় মিশাইল, তাঁর সৈন্য অকাতরে প্রাণ দিল। অবশেষে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করিয়া তাওকুয়াং সেইবারের মত দেশ রক্ষা করিলেন। তাঁর ঘরে শত্রু, বাহিরে শত্রু। ঘরে বিদ্রোহীরা ত্যক্ত-বিরক্ত করিতেছে, বাহিরে ইংরেজ মাথার টনক নড়াইয়া দিতেছে। চীন সম্রাট্ মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। ইংরেজকে তখনকার মত কাউলন উপদ্বীপ উপহার দিয়া খুসী করিতে হইল।

ইংরেজ ত খুসী হইলেন, কিন্তু বিদ্রোহের আগুন আর নেবে না। তারা ক্রমেই দলে ভারী হইতে লাগিল। খোলা অস্ত্র লইয়া তাহারা কহে 'মাঞ্চুরাজাকে তাড়াও।' বিদ্রোহীর দল ক্রমে রাজধানী পিকিনের দিকে আগাইয়া চলিল। সম্রাট্ তাদের জয়ধ্বনি নিজের প্রাসাদে বসিয়া শুনিতে পাইলেন।

ইংরেজ দেখিল—এই ত আবার সুযোগ আসিয়াছে। ফরাসী মাথা নাড়িয়া কহিল—'হাঁ, এইবার বড্ড সুবিধা!' তারপর দুই বন্ধুতে মিলিয়া চীনদেশ আক্রমণ করিলেন। তখন রাজ্যে বড় অরাজকতা, কে প্রজা, কে রাজা, কেউ তা' জানে না।—কে বা বিদেশীকে বাধা দেয় রাজ্যই

বা কে রক্ষা করে! রাজ-সৈন্য ত দু' একটা পটকার শব্দ শুনিয়াই দৌড়;—তাদেরই বা দোষ কি?—কোন দিক সামলাইবে? ইংরাজ-সৈন্য সোজা এবার পিকিনের পথ ধরিল। সম্রাট্ সংবাদ পাইয়া সিংহাসন ছাড়িয়া পলাইলেন,—অরাজক দেশ শত্রু আসিয়া দখল করিল। অত সাধের প্রাসাদখানি গোলার ঘায়ে নষ্ট হইয়া গেল। সেবার জেনারেল গর্ডন ছিলেন ইংরাজ সৈন্যের সেনাপতি।

সমস্ত চীনদেশে যেন ভগবানের অভিশাপ নিপতিত হইল। তাদের রাজা পলাতক, রাজধানী শত্রুহস্তে, সৈন্য-সামন্ত কে কোথায় গিয়াছে তার ঠিক ঠিকানা নাই। এক দিকে বিদ্রোহী চীনজাতি, আর দিকে বিদেশীর কামান—মাঞ্চুদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইয়া আসিল। কে এই দেশকে রক্ষা করিবে?

এই বিপদের মধ্যে মনের দুঃখে-কষ্টে চীনসম্রাট্ও মারা গেলেন। এই সময়ের কিছু পরেই ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। ভারতেও তখন বড়ই বিশৃঙ্খলা। থাক্ সে কথা। সম্রাটের ছেলে চিয়েনফেং রাজা হইলেন। সম্রাট্ তা-ও-কুয়াং এর অত সাধের ছেলে;—সুতরাং অনেকদিন আগে তাঁর বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। চিয়েনফেং সেই ভাঙ্গা রাজ্যের ভাঙ্গা সিংহাসনখানির উপর বসিয়া আবার বিবাহ করিবেন.

ঠিক করিলেন। নহিলে রাজা বলিয়া লোকে মানিবে কেন!

দিকে দিকে খবর গেল। যেখানে যার সুন্দরী কন্যা ছিল, যেখানে যার সুন্দরী বোন্ ছিল, মাঞ্চু প্রজারা রাজধানীতে লইয়া আসিল। রাজার ছেলে মেয়ে নাই, তাই সন্তানের আশায় রাজা বিবাহ করিবেন। বাছাই করিবার ও পছন্দ করিবার ভার পড়িল রাজার মায়ের উপর। চীনেরা এই সব ব্যাপারে হাত দিতে পারিত না। ওদেশের লোকের ধারণা চীনেদের মেয়েরা নাকি মাঞ্চুমেয়েদের চেয়ে কুৎসিৎ। মাঞ্চু রাজা মাঞ্চু মেয়ে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবেন—এই-ই ছিল তখনকার রীতি। বিধবা রাণী বাছিয়া বাছিয়া ছেলের জন্য যে মেয়েটি পছন্দ করিলেন, তাঁর নাম ইহোনালা। ইহোনালার যেমন রূপ, তেমন গুণ। রাজ্যের সবাই কহিল—'হাঁ, রাণী হওয়ার যোগ্য বটে।' কিছুদিন পরে, রাণী ইহোনালার গর্ভে শুভক্ষণে রাজার এক সুন্দর ছেলে হইল। তখন রাজ্যে যে আনন্দের ধুম পড়িল তার বর্ণনা কে করে!

*　　*　　*　　*

দেশের যখন এই অবস্থা, দেশ যখন এই রকম সুখে দুঃখে পাক খাইতেছিল, চীনের প্রজারা যখন বিদেশীর হাতে

লাঞ্ছিত হইতেছিল, গৃহহীন অর্থহীন দেশবাসীর চোখের জলে দেশ গলিয়া যাইতেছিল,—তখন চীনের ভবিষ্যৎ উদ্ধার কর্ত্তা সান-ইয়াৎ-সেন এক গরীবের ঘরে জন্ম নিলেন। হংকংএ ইংরেজদের একটা আড্ডা আছে। সান-ইয়াতের জন্মস্থান এই হংকংএরই নিকটে কংটাংএর অন্তর্গত এক গ্রামে। সে গ্রামের নাম সিয়ারসোল। এইখানে ম্যাকাও বন্দরে পর্ত্তুগীজদিগেরও একটা ঘাঁটি ছিল। চীনের ক্যানটন সহরের নাম-ডাক বড় কম নয়,—ক্যানটন সান-ইয়াতের বাড়ীর খুব কাছে।

তখন চারিদিকে অরাজকতা। সেই অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, অত্যাচারের চীৎকার ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে তখন কে জানিত, যে চীনের এই অশান্তির যিনি শান্তিবিধান করিবেন, তিনি আঁতুড় ঘরে মায়ের কোলে সুখে ঘুমাইতেছেন।

(৩)

সাধারণতঃ চীনেরা বৌদ্ধ। কিন্তু সানের বাবা ছিলেন খৃষ্টান। লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির তিনি একজন ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন। ধর্ম্মের কথা কহিতে ও পড়িতে তাঁর সময় কাটিত। একজন ইংরেজ মহিলা দয়া-পরবশ হইয়া সানের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। সান তাঁর সাহায্যে ইংরেজী শিখিলেন। তখনকার দিনে চীনেরা ইংরেজীর আদর করিত না। করিবেই বা কেন?

ইংরেজী ভাষা ও চীনাভাষা ত শিক্ষা করা হইল, এইবার সানের বাবা সানকে ক্যানটন সহরে পাঠাইয়া দিলেন। ক্যানটনে তখন অ্যাংলো-আমেরিকান মিশনারি সমিতির একটা হাঁসপাতাল ছিল। সান সেই হাঁসপাতালে কাজ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁর শিক্ষক ছিলেন— ডাক্তার কার্। রোগী দেখিতে দেখিতে ও হাঁসপাতালের কাজ করিতে করিতে সানের ডাক্তারী শিক্ষার উপর ভারী ঝোঁক পড়িল,—তাই ক্যানটন ছাড়িয়া কুড়ি বছর বয়সে তিনি হংকংএ আসিলেন। হংকংএ সেই বৎসরই

প্রথম ডাক্তারী শিক্ষার জন্ম 'হংকং মেডিক্যাল কলেজ' স্থাপন করা হয়। সান সেই কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। ডাক্তার হেস্কাই তখনকার দিনে বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর নামে হংকংএ একটী হাঁসপাঁতাল খুলিলেন। হংকং মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রেরা এই হাঁসপাতালে আসিয়া কাজ শিখিত।

পাঁচ বৎসর পরে পড়া শেষ করিয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, সান-ইয়াৎ-সেন মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তার হইয়া বাহির হইলেন। তিনিই হংকং মেডিক্যাল কলেজের প্রথম পাশ-করা ছাত্র। পাশ করিয়া সান ম্যাকাও বন্দরে যাইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিবেন স্থির করিলেন। সবাই তাঁহাকে সেই পরামর্শই দিলেন। সেখানে বন্ধুবান্ধবও যথেষ্ট আছে, আবার জায়গাটা বাড়ীর নিকটেও বটে। ডাক্তার সান ম্যাকাওএ ষ্টেথোস্কোপ পকেটে করিয়া রোগী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেখানে একটা প্রকাণ্ড হাঁসপাতাল ছিল। চীনা রোগীরা সেখানে আশ্রয় পাইত,—চীনদেশের দেশজাত ঔষধ-পত্র দিয়া সেইখানে চিকিৎসা করা হইত। সান-ইয়াৎ হাঁসপাতালের কর্ত্তাদের কহিলেন যে, তিনি তাঁর নূতন বিদ্যা অনুসারে চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করেন। হাঁসপাতালের কর্ত্তারা খুসী

হইলেন। তাঁহারা হাঁসপাতালের একটা অংশ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "আমরা দুই রকম চিকিৎসার ফলই দেখিব, যে পক্ষের ফল ভাল হইবে' সেই পক্ষের চিকিৎসা-কেই আমরা মানিয়া লইব।'

ছোট বেলা হইতেই সানের কেমন একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল যে, যে তাঁহার সহিত কথা কহিত, কিংবা তাঁহাকে দেখিত—সে-ই তাঁহার প্রতি মুগ্ধ হইয়া পড়িত। তাঁর মধ্যে কি একটা শক্তি ছিল যার দ্বারা সবাই তাঁর মুখের কথাটির জন্য তাঁর দিকে চাহিয়া রহিত।

সান যখন মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেন—তখন তিনি কলেজের ডীন (Dean) ডাক্তার ক্যানটাইলের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও শিষ্য ছিলেন। ইহাঁর কথা পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। তিনি সানকে তাঁর ছেলের অধিক ভাল বাসিতেন। ম্যাকাও বন্দরে ডাক্তারী (practice) করিবার সময় ডাক্তার ক্যানটাইল হংকং হইতে আসিয়া অনেকবার সানের গৃহে অতিথি হইতেন। কঠিন কোনও অস্ত্রোপচার থাকিলে হাসিমুখে সানকে সাহায্য করিতেন।

এমনি করিয়া দিন যায়,—কিন্তু সানের দিন আর কিছুতেই সুখে কাটে না। দেশে এই অশান্তি, দেশবাসীর নিত্য নিত্য এই অপমান—নিত্য নিত্য এই অত্যাচার সানের বুকে বড়

বাজিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—কি করিয়া দেশে শান্তি আনিতে পারা যায়। মাঞ্চুরাজা চীনাদের সঙ্গে কখনই ভাল ব্যবহার করিবেন না, রাজায় প্রজায় যে মধুর সম্বন্ধ তাহা আর কখনও স্থাপিত হইবে না। চীনাদের উন্নতির জন্য রাজা প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া এক কপর্দ্দকও খরচ করিবেন না। দেশটা যাহাতে চিরদিন অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়িয়া থাকে সেই তাঁহার ও তাঁহার ক্ষমতাপ্রয়াসী প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের ইচ্ছা। এই গভীর নৈরাশ্য হইতে কে দেশকে রক্ষা করিবে? এই অশান্তি ও অরাজকতা হইতে চীনজাতিকে কে বাঁচাইবে? সমস্ত জগতের লোক আজ জাগিয়াছে,—আর চীন এখনও পরের দাসত্ব করিয়া, পরের পাদুকা বহন করিয়া অজ্ঞতার অন্ধকারে পড়িয়া রহিবে!—দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া সানের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল!

চিয়েনফেং কেবল নামেই রাজা রহিলেন। প্রকৃত রাজত্ব করিতে লাগিলেন রাণী ইহোনালা। পূর্ব্বে সবাই যাহা দেখিয়াছিল, সবাই যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা কিছুই হইল না। রাজরাণী হইয়া ইহোনালার চরিত্রে পরিবর্ত্তন ঘটিল। যিনি স্বর্গের দেবী ছিলেন, কেমন করিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় খানিকে কঠোর নির্ম্মমতা আসিয়া অধিকার করিয়া বসিল। মাঞ্চুরাণী চীনাদের দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। চীনাদের কথা শুনিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। রাণী যাহা করিতেন, যাহা বলিতেন, স্ত্রৈণ সম্রাট্ তাহাই মানিয়া লইতেন। প্রজারা আশ্চর্য্য হইল—চীন দেশে রমণীর রাজত্ব এই প্রথম।

সম্রাট চিয়েনফেং ফরাসী ও ইংরেজের সহিত সন্ধির জোগাড় দেখিতেছিলেন, রাণী সে উদ্যোগ ভাঙ্গিয়া দিলেন। রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন, "বর্ব্বর ইংরেজ ও ফরাসীর সহিত আবার মিতালি কেন? সমস্ত শক্তি দিয়া আমরা তাহাদিগকে দূর করিয়া দিব।" তারপর রাণী এক অদ্ভুত

আদেশ প্রচার করিলেন, "যে ব্যক্তি ইংরেজ কিংবা ফরাসীর মুণ্ড আনিতে পারিবে সে ৫০০ শত মুদ্রা পাইবে, আর যে বর্ব্বরদিগের একটি জাহাজ দখল করিতে পারিবে, সে ৫০০০ হাজার মুদ্রা পুরস্কার পাইবে।" এই আদেশের ফল ফলিল। চীন সৈন্যের মধ্যে নূতন উৎসাহের ভাব জাগিয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া রাণী খুসী হইলেন।

কিন্তু তারপরে আর বেশী দিন কাটিল না,—সম্রাট্ অসুস্থ হইয়া জেহল নামক স্থানে শয্যা আশ্রয় করিলেন। সিংহাসনের দিকে সকলের নজর গেল।

রাজপুত্র তখন নাবালক। সুতরাং তার অভিভাবক দরকার। রাজার প্রিয়পাত্র সম্ভ্রান্তবংশীয় কয়েকজন নেতা এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। প্রিন্স'ই' ছিলেন এদের চাঁই,—সুসুন জোগাইলেন ইন্ধন। সুসুনের অগাধ টাকা। চীনদেশে তখনকার দিনে তাঁর মত অর্থ আর কারো ছিল না। সুসুন বাংলার জগৎশেঠ। তৃতীয় ব্যক্তির নাম টুয়ানহু, ইনি একজন বড় যোদ্ধা। এত বড় বড় বীর এক দিকে, আর একদিকে রাণী ইহোনালা,—কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে মাত্র। কিন্তু রাণী বড় সাধারণ মেয়ে ছিলেন না। তিনি এতটুকু ভয় পাইলেন না,—সম্রাটের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। মৃত্যুর সময়

বড় বড় বীরেরা সম্রাটের শয্যার চারিদিকে উপস্থিত হইলেন;—মহাত্মা কন্‌ফুসীর নাম স্মরণ করিতে করিতে সম্রাট চিয়েনফেং চক্ষু মুদিলেন।

রাজা চিরজন্মের মত চলিয়া গেলেন। তাঁর মৃত্যুশয্যায় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রিন্স 'ই' ঘোষণা করিলেন,—'আজ হইতে তিনি নিজে, সুস্থন এবং টুয়ানহু রাজ্যের অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন,'—ইহা সম্রাটের শেষ আদেশ। রাণী ইহোনালা এই কথার কোনও প্রতিবাদ করিলেন না। মৃতস্বামীর পাংশু মুখখানির দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। তারপর একবার নত হইয়া ভগবানের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সেই রাত্রেই রাণী পাঁচশ শরীর-রক্ষী সৈন্য লইয়া জেহল ছাড়িয়া চলিলেন। রাজার মৃতদেহ তেমনই ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে পড়িয়া রহিল। রাণী বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।—তাঁর চক্ষে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল,—তিনি এক হাতে বুকখানা চাপিয়া ধরিলেন। প্রিন্স'ই' রাণী কোথায় গেলেন, কি করিলেন অতশত খোঁজ করিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না। পথের ধূলায় আকাশ ছাইয়া রাণীর সৈন্য রাজধানী পিকিনে আসিয়া পৌছিল। রাণী আসিয়াছেন—প্রধান মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি আসিয়া রাণীকে অভ্যর্থনা

করিলেন—সেইদিনই রাণী ইহোনালা চীন সাম্রাজ্যের রাণী বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

রাণী সৈন্যদের হাত করিলেন। প্রজারা রাজা চিয়েনফেংএর মৃত্যুতে দোকানপাট বন্ধ করিল। রাজ্যের যত নরনারী ইহোনালার সম্মুখে নত হইয়া তাঁহাকেই রাণী বলিয়া মানিয়া লইল। রাণীর চক্ষু দু'টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এদিকে 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' প্রিন্স'ই' ও সুস্থন ধীরে ধীরে রাজার মৃতদেহ লইয়া রাজধানীতে আসিয়া পঁহুছিলেন। রাণী তাঁদের অভ্যর্থনার যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিনা আয়াসে তাঁহাদিগকে বন্দী করা হইল। বিচার হইল—বিচারে তাঁহারা রাজদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। রাণীর আদেশে প্রিন্স 'ই' ও টুয়ানহুকে নিজের হাতে আত্মহত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য করান হইল। অস্ত্রের আঘাতে সুস্থনের দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত করা হইল। বিদ্রোহীর রক্তে স্নান করিয়া রাণী ইহোনালা রাজদণ্ড ধরিলেন। শিশু পুত্রের নামে চীন সাম্রাজ্যের কর্ণধার একমাত্র তিনিই রহিলেন। মুদ্রার উপরে তাঁহার মূর্ত্তি খচিত হইল।

রাণী ফরাসী ও ইংরেজের সহিত সন্ধি করিলেন। তিনি

দেখিলেন,—ইহাদের সহিত শত্রুতা করিয়া বড় সুবিধা হইবে না। ইংরেজের সহিত চীনের তখন একগলা ভাব। ব্যাপার এতদূর গড়াইল যে, ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল গর্ডন চীনা বিদ্রোহীদের সঙ্গে রাণীর পক্ষ হইয়া, যুদ্ধে তাহাদিগকে হারাইয়া দিলেন। টেপিং বিদ্রোহের কথা ধীরে ধীরে লোকের মন হইতে মুছিয়া গেল।

রাণীর ধমনীতে মাঞ্চুরক্ত, মাঞ্চুদের মতই তিনি সাহসী ছিলেন। কিন্তু যখন সুসুনের প্রভূত অর্থ তাঁহার করায়ত্ত হইল,--রাণী ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে লাগিলেন। চীন দেশে এত বড় বড় রাজা, এত বড় বড় সম্রাট রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইহোনালার মত প্রতাপ কাহারো হয় নাই। রাণীর কথায় উপরে কেহ কথা কয় না, রাণীর কাজে কেহ বাধা দেয় না।

চীন দেশে একটা প্রথা আছে যে, দরবারে কেহ যদি হঠাৎ কোনও কারণ ব্যতীত দাঁড়াইয়া উঠেন, তবে মনে করিতে হয় যে তিনি আসন্ন কোনও বিপদ হইতে রাজা বা রাণীকে রক্ষা করিতে চান। একদিন দরবারে হঠাৎ প্রিন্স কুং এমনি কোন কারণ না থাকাতে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া রাণী তাহা দেখিতে পাইলেন। সেখান হইতেই গম্ভীরস্বরে কহিলেন,

"প্রিন্স, আজ হইতে আপনি এ দরবারে আর আসিবেন না, এখনি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যান।" অবাক হইয়া প্রিন্স ধীরে ধীরে দরবার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। রাণীর এই অদ্ভুত খেয়ালের কেহই প্রতিবাদ করিল না।

ঘরে বাহিরে কাহারও প্রাণে শান্তি রহিল না। রাণী জু-আন বড় ভাল মানুষ; তিনি রাণীর সতীন। একদিন রাত্রে হঠাৎ তাঁহার অসুখ হইল। চীনা ডাক্তারেরা আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া অসুখটা যে কি তাহা ঠাহরই করিতে পারিল না। পরদিন সকালে রাণী জু-আন মারা গেলেন। সবাই কানাকানি করিল, "বড়রাণীর চক্ষু পড়িয়াছিল। আর কি বাঁচিতে পারে? খাবারের সঙ্গেই বোধ হয় কিছু দেওয়া হইয়াছিল।" — এমনি কত কি কথা শোনা গেল,— আসল ব্যাপার অন্ধকারেই পড়িয়া রহিল।

রাণী নাবালক ছেলের নামে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ছেলে ক্রমে বড় হইল,—ঘটা করিয়া ছেলের বিবাহ দিলেন; রাজপুত্র কোনদিন রাজকার্য্য দেখিতেন না। সারাদিন বাজে আমোদ করিয়া কাটাইয়া আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া শীকার করিয়া কাটাইতেন। রাণী কোন কথা কহিতেন না। রাজার ছেলে স্ফূর্ত্তি করিবে না—এত ধন দৌলত তবে কিসের জন্য? কিন্তু বেশীদিন আর কাটিল না। রাজপুত্র কঠিন

রোগে হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। রাজ্যের লোক রাণীকে ভাল না বাসিলেও রাজপুত্রকে ভালবাসিত। রাজপুত্র গেলেন—ছোট বৌটি কাঁদিয়া বুক ভাসাইল। রাজপুত্র যখন মারা যান—তখন রাজবধূ গর্ভবতী ছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার পরমসুন্দর একটি ছেলে হইল। রাজবধূ এ-লু-টি ছেলের অমন সুন্দর মুখ দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

কিন্তু ভগবান যাঁর কপালে সুখ লিখেন না—তাঁর এই রকমই হয়। রাজপুত্র মারা গেলেন, রাণী ইহোনালা দেখিলেন,—এ-লু-টির যদি ভবিষ্যতে সন্তান হয় তবে রাজ্যের কর্তৃত্ব ভার সেইই পাইবে, কারণ তখন এ-লু-টি রাজমাতা হইবেন। রাজত্বের অভিলাষী, সম্মানের অভিলাষী, ক্ষমতার মদিরায় ক্ষিপ্ত রাণী ইহোনালার তাহা সহ্য হইল না। যে একবার ক্ষমতার আস্বাদ পায়, সে কি সহজে তাহা ছাড়িতে চায়! এ যেন শার্দ্দুলের রক্ত পিপাসা!

রাণী ইহোনালা এক ফন্দী করিলেন। রাজবংশে প্রিন্স চু’ন ছিলেন এক জবরদস্ত লোক, রাণী তারই শিশু পুত্রকে পোষ্য লইলেন। এ-লু-টি সব শুনিলেন, নীরবে তাঁর চোখ দিয়া জল পড়িল। তখনো তাঁর ছেলে হয় নাই। এ-লু-টি ভাবিলেন, এ জীবন আর রাখিব না। যার জননী এমন ভাবে নিজের

সন্তানের নন্দদুলাল বংশধরের উপর ঈর্ষ্যা করে, তার সংসারে আসিয়া আর কি হইবে। আর রাণী ইহোনালা—তাঁর সঙ্গে কে মুখোমুখী কথা কহিতে সাহস করিবে! এ লু-টির মনে পড়িল, আত্মহত্যা করিলে যে স্বামীর বংশ নষ্ট হইয়া যাইবে। সময় মত ছেলে হইল—বড় সুন্দর ছেলেটি। ছেলেকে বুকে করিয়া এ-লু-টি কাঁদিয়া আকুল হইলেন। পরদিন সবাই দেখিতে পাইল এ-লু টি বিষ খাইয়া মরিয়া রহিয়াছেন, আর ছোট্ট ছেলেটি তারই পাশে বুকের দুধ না পাইয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে। রাজবাড়ীতে এক অতি পুরাণো ধাই ছিল,—সে আসিয়া ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া লইল। রাজ্যের লোক এই কথা শুনিয়া ভাবিল, "আর নয়—এইবার পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে।"

কিন্তু দেশের লোকের বিষচক্ষু পড়িলেও ভগবান যে এই পাপের কাহিনী জানিতে পারিয়াছেন, এমন বোঝা গেল না। রাণী ইহোনালা অসীম প্রতাপে দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। রাণীর বহু অনুচর জুটিয়া গেল, রাজপ্রাসাদট কতগুলি নিরক্ষর মোসাহেব আর নিষ্কর্ম্মার আড্ডায় পরিণত হইল। কিন্তু রাণী তাদের কথায় কোন কাজ করিতেন না। সে বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা স্থিরচিত্ত ছিলেন।

নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাতে কাহারও বাধা দেওয়ার সাধ্য ছিল না।

দেশ হইতে ভাল ভাল কাজের সংখ্যা কমিয়া গেল। রাণী দুই হাতে নিজের সুখ সুবিধা আনন্দের জন্য অজস্র টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন। প্রজার দুঃখ বাড়িয়া চলিল। গরীবের কষ্টের আর সীমা রহিল না। তাদের কাতর চীৎকার রাণীর কাণে বুঝি পৌঁছিল না। তিনি হীরা মতি চুণি-পান্নায় সাজিয়া মর্ম্মর প্রাসাদে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। আর দিন রাত্রি নাচ গান ত লাগিয়াই ছিল।

পরিশেষে রাণীর মতিভ্রম হইল। রাজ্যের প্রকৃত হিতকামীদের পরামর্শ তিনি আর শুনিতেন না, শেষে মোসাহেবরা যাহা কহিত তাহাই স্বস্তি বলিয়া মানিয়া লইতে লাগিলেন। লিহং কিংবা ইয়ানসিকাইএর মত বড় বড় শাসনকর্ত্তা কিংবা বিচক্ষণ সেনাপতির কথা বিষের মত মনে হইল।—সুযোগ বুঝিয়া জাপান চীনদেশ আক্রমণ করিল। রাণী যুদ্ধের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর নৌসৈন্যের মধ্যে তখন বিশৃঙ্খলা কত! সৈন্যেরা বেতন পায় নাই,—না আছে ভাল কামান,—না আছে ভাল দু'খানা জাহাজ। নৌবিভাগের অর্থে রাণীর মর্ম্মরায়তনের সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে,—সে সব অর্থ রাণীর আনন্দ

মদিরার অজস্র আনন্দ ধারায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে—কেউ তার হিসাব রাখে নাই।

নাচে গানে আহাবে বিহারে রাণীর দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইতে ছিল। দেশের প্রজার কাতর ক্রন্দন আর জাপানীদের কামানের আওয়াজ কোনটাই পাষাণীর পাষাণময় হৃদয়ে আঘাত করিতে পারিল না।

চীনপ্রজারা নিরুপায়, চারিদিকে অন্ধকার, কোথাও আশা নাই, পথ নাই। সকলে ভাবিল এইবার একটা প্রলয় ঘটিবে। প্রাণে আর কত সয়?

(৫)

সোনার দেশের দিকে দিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অর্থের অভাব, শিক্ষার অভাব, প্রাণের অভাব, চীনেরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল। আগুন ধূঁয়াইতে লাগিল, হঠাৎ একদিন দশদিক আলোকিত করিয়া সে আগুণ ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিল। সকলের বুক কাঁপিয়া উঠিল!

ম্যাকাও বন্দরের পর্ত্তুগীজকর্ত্তা ডাক্তার সানকে কহিলেন, "ওহে বাপু চীন ডাক্তার, পর্ত্তুগীজের আওতায় তোমার ডাক্তারি করা চলিবে না। তুমি তল্পী তোল।" সান হাসি মুখে ম্যাকাও ছাড়িয়া ক্যানটনে আসিয়া বসিলেন। কিন্তু এখানে আসিয়া তিনি খুব বেশী দিন ডাক্তারী করেন নাই। যখন তিনি ম্যাকাও বন্দরে ছিলেন, তখন এই ক্যানটন শহরে সকলের প্রথমে "নবীন চীন" নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। ইহারই চীনা নাম সিংচুং। দেশের মুক্তিলাভ এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ক্যানটনে আসিয়া তিনি এই সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন।

যেমন করিয়াই হৌক, দেশের দুর্দ্দশা দূর করাই এই সমিতির লক্ষ্য ছিল। প্রথমতঃ "নবীন চীন" সমিতি প্রকাশ্যভাবে আন্দোলন করা সুরু করিয়া দিল। প্রচলিত শাসন পদ্ধতিকে বদলাইবার জন্য সমিতি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, অহিংসা দ্বারা বিনা রক্তপাতে যাহাতে কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। দেশময় এই আন্দোলন চলিল। 'নবীন চীন' সমিতির সভ্য সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। সান ইয়াৎ নবীন উদ্যমে কাজ করিতে লাগিলেন। তখন সানের নাম কে না জানে, তাঁর সুখ্যাতি কে না করে! ধীরে ধীরে দেশের আর্থিক উন্নতির দিকে, শিক্ষার উন্নতির দিকে, এবং নিজের নৈতিক চরিত্রকে কিঞ্চিৎ উন্নত করিতে লোকের মনে ইচ্ছা হইল। এতদিন এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে কেহ চীনজাতিকে জীবনের আলো দেখায় নাই, তাহারা কে, অতীতে তাহারা কত বড় ছিল এবং বর্ত্তমানে প্রকৃত অবস্থা যে কি চীনেরা তাহা ভাল বুঝিত না। 'নবীন চীনের' নবীন পূজারীরা দেশের লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন,—তোমরা কত নীচে নামিয়া গিয়াছ,—তোমরা কি ছিলে আর কি হইয়াছ। এই সমস্ত শিক্ষার প্রভাবে ধীরে ধীরে গভীর নিদ্রায় চীন জাতি যেন

বিছানায় একবার পাশ ফিরিয়া শুইয়া রহিল। ধীরে ধীরে 'নবীন চীন' দেশের লোকের সহানুভূতি লাভ করিল।

একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা এইখানে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশে এই রকমের সমিতিগুলি গত আন্দোলনের যুগে দেশের জনসাধারণের সহানুভূতি ত' পায় নাই,—বরং দেশের লোকের সহায়তায় তাহাদের ধ্বংসের পথ পরিস্কৃত হইয়াছে মাত্র।

দেশকে উন্নত করিতে হইলে, দেশের লোকের সঙ্গে না মিশিলে চলে না। চীনারা দলে দলে সমিতিতে আসিয়া যোগ দিল। সকলেই মনে মনে রাজার উপর অসন্তুষ্ট,—এই পাশবিক শাসনের উপর বিরক্ত। ক্রমশঃ একটা ভাব পরিস্ফুট হইল,—রাজার রাজত্ব ঘুচিয়া যাউক—আমরা প্রজারা দেশ শাসন করিব। রাজা অত্যাচার করিবার কে? প্রজারা এত কষ্ট করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, রাজ্যের জন্য পরিশ্রম করে আর তাহাদেরই' দুঃখের ধন লইয়া রাজা স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়ান্—কি অধিকার তাঁর?—এই ভাব সর্ব্বত্র। ইহার মূলে ছিল 'নবীন চীনের' অতুলনীয় শিক্ষা।

প্রথমতঃ, সমিতির বহু সভ্য মিলিয়া এক দরখাস্ত করিলেন। রাজা ও গবর্ণমেণ্টের কাছে প্রার্থনা করা

হইল, এই অত্যাচার, প্রজার উপর এই অনাচার, রাজার শাসনকার্য্যে এই প্রকার যথেচ্ছ ব্যবহার যেন বন্ধ করা হয়। দেশের লোকের এই কাতর প্রার্থনা কিন্তু রাণীর কাণে গেল না। রাজা নাবালক, তিনি কিছুই বুঝেন না। চীন গবর্ণমেণ্ট তখনকারমত দরখাস্ত চাপা দিয়া রাখিলেন, কারণ তখন জাপানসৈন্য আসিয়া চীন সাগরের তীরে হুঙ্কার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট জাপানী সৈন্যকে বাধা দিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। জাপানী সৈন্য চীন উপকূলে অবতরণ করিল,—চীন সৈন্য শত্রুর সেই কামানের গোলার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না, পিকিনের দিকে পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। পরাজিত হইয়া চীন গবর্ণমেণ্ট জাপানের সহিত সন্ধি করিলেন। একে একে চীনের হস্ত হইতে ফরমোজা, পোর্টআর্থার খসিয়া পড়িল। পরাস্ত হইয়া মাথা নীচু করিয়া চীন সম্রাজ্ঞী সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

চীনা গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে হারিয়া যত রাগ ঝাড়িলেন 'নবীন চীন' সমিতির উপরে। রাণী এবং তাঁর গবর্ণমেণ্ট এই সমিতিকে বিশ্বাসঘাতক ও বিদ্রোহী আখ্যায় ভূষিত করিলেন। সমিতির প্রার্থনায় কেহ কাণও দিল না। কি ভাবে এই সমিতিকে নষ্ট করিয়া ফেলা যায়, গবর্ণমেণ্ট তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রজাদের উপর

অত্যাচারের মাত্রা বাড়িল বৈ, কমিল না। রাণীর গুপ্তচর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারে সকলেই বড় দুঃখিত হইল॥ 'নবীন চীনের' গুপ্ত সমিতির এক গুপ্ত বৈঠক বসিল! সান ইয়াৎ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। অনেক বাকবিতণ্ডার পর স্থির হইল যে, গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আর ভাল মানুষী করা চলেনা, যে যেরকম তার সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করিতে হয়। এই অত্যাচারী মাঞ্চুদের তাড়াইতে হইলে তলোয়ার, গুলি আর বারুদ না হইলে চলিবে না, —সবাই একমত হইয়া এক সঙ্গে সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সেইদিন হইতেই 'নবীন চীনের' কার্য্য পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

তখন কেবল চাই অর্থ আর মানুষ। এমন মানুষ চাই —যারা রৌদ্রে পুড়িবে না, বৃষ্টিতে কাহিল হইবে না, বিপদের আগুনে' সর্ব্বদা স্থির রহিবে। আর অর্থ? যে যেমনভাবে পারে—নানা ফিকিরে নানা জোগাড়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সবকাজ গবর্ণমেণ্টের গুপ্তচর ও পুলিশের চক্ষু এড়াইয়া করা হইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট ইহার বিন্দু বিসর্গও টের পাইলেন না। এমন চমৎকার বন্দোবস্ত।

জাপ যুদ্ধ হইয়া গেল। তখন আর বেশী সৈন্য রাখার দরকার নাই, তাই গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি সৈন্যকে সৈন্যদল হইতে বিদায় দিলেন। এই দলভ্রষ্ট সৈন্যেরা তখন সানের সহিত ক্যানটনেই ছিল। সমিতি ইহাদিগকে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন।.........এমনি নানাভাবে লোক ও টাকা আসিয়া সমিতির কার্য্যকে সাফল্যের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। অস্ত্র শস্ত্র গোলা বারুদ ও কম পাওয়া যাইতেছিল না।

১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাসে একটা দিন স্থির করা হইল। সমিতি ঐ দিনে ক্যানটন সহর অধিকার করিবেন এইরূপ বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল। চারিদিকে অস্ত্র শস্ত্রদ্বারা সুসজ্জিত 'নবীন চীনের' নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত সৈন্যেরা গোপনে প্রস্তুত রহিল। ক্যানটন সহরের অলিগলিতে সর্ব্বত্র বন্দোবস্ত ঠিক। ওদিকে হংকং এ চারিশত যোদ্ধা প্রস্তুত। কথা রহিল, সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহারা হংকং হইতে যাত্রা করিয়া ক্যানটনের সৈন্যদলের সহিত যোগদান করিবে।

সেইদিন—সেই ভীষণদিনের মাত্র আর একটা দিন বাকী আছে। সমিতির কর্ত্তারা স্থির করিয়াছিলেন যে, কার্য্যকালে যত কম রক্তপাত করিতে পারা যায়, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। সেই অনুসারে সর্ব্বত্র গুপ্ত

আদেশ প্রচারিত করা হইয়াছিল। আজ কে জানে কাল কি প্রলয় ঘটিবে! চীনের জীবনে আগামী দিবস কি বার্ত্তা বহন করিয়া আনিবে—তাহা এক ভগবানই জানিতেন। সকলের বুকের রক্ত নাচিয়া উঠিল। সমিতির প্রধান সভ্যগণ পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে গুপ্তস্থানে বৈঠক করিলেন। বৈঠক চলিতেছে। এমন সময়ে গুপ্ত সংবাদ আসিল—'প্রস্তুত হও, গভর্ণমেণ্ট ভিতরের সব খবর জানিতে পারিয়াছেন।' সর্ব্বনাশ!

কিন্তু সমিতির সভ্যরা ধীরভাবে সভার কার্য্য শেষ করিলেন। ভবিষ্যতে কি পদ্ধতিতে কাজ চলিবে তাহার আলোচনা হইয়া গেল। সমস্ত কার্য্য স্থির হওয়ার পর কর্ম্মী-বৃন্দ একে একে বিদায় হইলেন। তারপর? তারপর যে যেদিকে পারিল পলাইল। সৈন্যরা কেহ ধরা পড়িল, কেহ বা লুকাইয়া বাঁচিল। হংকং হইতে ষ্টীমারে চড়িয়া নবীন সমিতির চারিশত সৈন্য ক্যাণ্টন বন্দরে অবতরণ করিল। তাহারা তখনও জানিত না যে, ভিতরের গুপ্ত সংবাদ গভর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়াছেন। বন্দরে অবতরণ করিবার সময় তাহাদের আটক করা হইল।

আর সান? বহু কষ্টে অনেক বিপদ মাথায় করিয়া সানইয়াৎ ক্যানটন ছাড়িয়া ম্যাকাও সহরে উপস্থিত হইলেন।

প্রথম যখন নবীন চীন সমিতি স্থাপিত হয়, তখন সেই সমিতির প্রধান কার্য্যকরী সভার সভ্যসংখ্যা ছিল আঠার জন। তাঁহাদের সকলেই পুলিশের হাতে ধরা পড়িলেন। ভগবানের কৃপায় কেবল সান ইয়াৎ পুলিশের চক্ষু এড়াইয়া ম্যাকাও সহরে পলাইয়া গেলেন। সেইখানে থাকিয়া সান শুনিতে পাইলেন, সমিতির সেই আঠার জনের মধ্যে ধৃত সতর জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অবশিষ্ট রহিলেন —সানইয়াৎ স্বয়ং। সান নীরবে চোখ মুছিলেন। তাঁর বুক ভাঙ্গিয়া গেল। এত সাধের আশা অতি সহজে শেষ হইয়া গেল। ম্যাকাও হইতে তিনি হংকংএ লুকাইয়া লুকাইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেখানেও পুলিশের গুপ্তচর তাঁহার পিছু পিছু চলিল। এই সময়ের মধ্যে কতবার যে তাঁর জীবন বিপন্ন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। হংকংএ মিষ্টার ডেনিস নামে এক ভদ্রলোকের সহায়তায় তিনি সেস্থান হইতে পলায়ন করিয়া হুনুলুলুতে চলিয়া গেলেন।

সমিতির প্রথম চেষ্টা বিফল হইল, কিন্তু তাহাদের অন্তরে অন্তরে যে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা নিভিয়া গেল না,—ভস্মাবৃত হইয়া পড়িয়া রহিল। নানা বিপদের মধ্যেও সমিতির কাজ কখনও স্থগিত রহে নাই। গোপনে গোপনে আবার গুলি গোলা বারুদ যোগাড় হইতে

লাগিল, নূতন মানুষ আসিয়া দলে দলে যোগ দিতে আরম্ভ করিল। সমিতি স্থির করিলেন যে, গভর্ণমেণ্টের অস্ত্রাগার দখল করিতে হইবে। নহিলে সমিতির অস্ত্রশস্ত্রের অভাব মোচন হইবে না—ক্রয় করিয়া আর কত পারা যায়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিন চারবার সরকারী অস্ত্রাগার আক্রমণ করা হইল। কিন্তু কোনবারই উদ্দেশ্য সফল হইল না। সমিতির সৈন্যদল কোনবার হারিয়া পলাইল, কোনবার পূর্ব্বেই গভর্ণমেণ্ট সংবাদ পাইয়া সাবধান হইলেন,—আর কোনও বার যুদ্ধ করিতে করিতে গুলি গোলা ফুরাইয়া যাওয়ায় বাধ্য হইয়া অস্ত্রহীন সৈন্যরা ধরা পড়িল। কাহারো বিচারে (!) প্রাণদণ্ড হইল, কাহারো হইল নির্ব্বাসন,—আর কেহ বা যাবজ্জীবন কারাগারে পচিতে লাগিল।

পদে পদে ঠেকিয়া ও ঠকিয়া বিদ্রোহীরা সজাগ হইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁদের বুদ্ধি নানাদিকে খেলিতে ছিল। একবার ম্যাকাও বন্দরের কাছে একটি জায়গায় বহুসৈন্য একত্রিত করা হইল। জায়গাটার চারিদিকে পাহাড়। পথ ঘাট সব তাদেরই দখলে। সেই প্রাকৃতিক দুর্গের মধ্যে থাকিয়া বিদ্রোহী সৈন্যরা তাহাদের নেতাদের অপেক্ষা করিতে লাগিল। বিদ্রোহী নেতারা

হংকংএ জমায়েৎ হইয়াছিলেন,—সানইয়াৎ হুনলুলু হইতে আসিবেন—তাঁহারই অপেক্ষায়। সেই বিপদের ঝড় মাথায় করিয়া সান আবার হংকংএর দিকে ছুটিলেন,—শান্তির আশ্রয়-নীড় তাঁর পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। বিদেশের হাওয়া তাঁর আর ভাল লাগিল না। দেশের ডাকে তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। কিন্তু হংকংএ তিনি নামিতে পারিলেন না,—গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে তাঁহাকে বাধা দেওয়া হইল। সান জাহাজে থাকিয়াই সেদিন শুনিতে পাইলেন, তাঁর দুইটি প্রিয় কর্ম্মী শিষ্য বন্দী হইয়াছেন। হংকংএ আসিবার পূর্ব্বে নবীন চীন সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সান নানাস্থান হইতে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া ইহাদের সহিত সমিতির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কোনও উপায়ে এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া উক্ত কর্ম্মী দুইটিকে হংকংএ ত নামিতে দিলেনই না, বরং সিঙ্গাপুরে লইয়া যাইয়া আটক করিয়া রাখিলেন। এই ভাবে একদিকে টাকা সিঙ্গাপুরে থাকিয়া গেল, আর একদিকে সান জাহাজ হইতে নামিতেই পারিলেন না। সমিতির দুই আশা—টাকা ও সানইয়াৎ। কিন্তু কোনটাই সময়মত আসিয়া পৌছিল না।

সান হংকং ছাড়িয়া চলিলেন—কিছুতেই সেখানে জাহাজ হইতে নামিতে পারিলেন না। তারপরে সিঙ্গাপুরে যাইয়া

অনেক হাঁটাহাঁটি, অনেক তদ্বির, অনেক দরবার করার পরে টাকা ও তাঁর বন্ধু কর্ম্মী দুইটিকে ফিরিয়া পাইলেন। কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইলেন যে, "ও টাকা ব্যবসায় করিবার জন্য ; অন্য কোন কারণের জন্য এই টাকা নহে।" কিন্তু তখন সময় চলিয়া গিয়াছে। সান যখন আবার হংকংএ আসিলেন তখন নেতারা ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছেন—সমস্ত উদ্যোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সান ইয়াতের মনে বড় দুঃখ হইল—এত কষ্ট করিয়া এত অর্থ যোগাড় করিয়াছেন, অথচ তাহা দিয়া কোন কাজই হইল না। সান সংবাদ পাইলেন,—সৈন্যদল তেমনি পর্ব্বতবেষ্টিত জায়গায় বসিয়া 'ভেরেণ্ডা' ভাজিতেছে। তাহারাই বা কি করিবে? সান ভাবিলেন, উহাদের সঙ্গে একবার দেখা করিতে হইবে। কিন্তু কি করিয়া সাক্ষাৎ করা যায়? গবর্ণমেণ্টের গুপ্ত পুলিশ সর্ব্বদা তাঁর পিছনে রহিয়াছে। তিনি খবর পাঠাইলেন যে, একশ মাইল দূরে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে যেন তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকে। দেশভক্ত কর্ত্তব্য পরায়ণ সৈন্যদল সেই একশ মাইল পথ হাঁটিয়াই চলিল। পথে দুই তিনবার গবর্ণমেণ্টের লোকের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহও যে না হইল এমন নহে। নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সানের সহিত তাহাদের দেখা হইল। চোখের জল ফেলিয়া সান তাহাদের বিদায় দিলেন,

কহিলেন "যদি চীন দেবতারা আবার কখনো দিন দেন, তবে দেশের কাজে যেন আবার আমি তোমাদের পাই।"

ছলছল চোখে সবাই বিদায় গ্রহণ করিল।......সৈন্যদল যে যার ঘরে ফিরিয়া গেল। সানের এত আশা, এত পরিশ্রম সব বুঝি বৃথা ব্যর্থ হইয়া গেল। সান কিন্তু আশা ছাড়িলেন না।

জন্মভূমির নিকট প্রণত হইয়া বিদায় লইলেন।

(৬)

রাণী ইহোনালার ইচ্ছা হইল,—পোষ্যপুত্র রাখেন। চীনা রাজ-দরবারে প্রিন্স চুʼনএর খুব খাতির ছিল। রাণী তাঁর পুত্র কোয়ানস্থকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন। কোয়ানস্থ সিংহাসনে বসিলেন, কিন্তু রাজ্যের রশ্মি ঠিক রাণী ইহোনালাই ধরিয়া রহিলেন। রাজা হইয়াই কোয়ানস্থ রাজ্যের অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাহাতে চীন সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসে,—কোয়ানস্থর ইচ্ছা হইল একবার তাহা সংঘটিত করিবার জন্য প্রয়াস করিয়া দেখেন। কিন্তু চারিদিকের বাধাবিঘ্ন দেখিয়া তিনি বড় দমিয়া গেলেন, কিন্তু আশা ত্যাগ করিলেন না। প্রজাদের কাতর ক্রন্দনে তাঁর মন আর্দ্র হইল। কেহ কেহ তাঁহাকে পরামর্শ দিল যে, অতি সত্বর দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে দেশের আর মঙ্গল নাই। কোয়ানস্থ দেশের প্রকৃত মঙ্গল কিসে হইতে পারে তাহা ভাবিয়া আর দ্বিতীয় পন্থা না পাইয়া দেশের অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও বিচক্ষণ

ছিলেন,—কিন্তু তাঁহার বয়সের অল্পতা থাকায় বুদ্ধির পরিপক্কতা ঘটে নাই, তাই, তিনি সর্ব্বস্থলে কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হইলেন না।

রাণী ইহোনালা প্রায়ই এমন ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন যেন তিনি রাজকার্য্য আর কখনও দেখিবেন না কিন্তু ক্ষমতার মদিরা এত প্রবল যে, দশ বৎসর যাবৎ এই রকম বাহিরে ফাঁকি দিয়া তিনি নিজেই রাজত্ব করিয়া চলিলেন। তিনি তাঁর মন্ত্রী কিংবা কোন বিচক্ষণ লোকের সহিত আর পরামর্শ করিতেন না। শুধু কতকগুলি খোসামুদে খোঁজায় তাঁর দরবার ভরিয়া গেল। তিনি তাঁদের কথাই বেদবাক্য বলিয়া মনে করিতেন। মন্ত্রীরা সকলেই তাঁর তাঁবেদার ছিলেন। ইঁহারা সকলেই বয়সে প্রাচীন ছিলেন, তাই ইহাদের মতও ছিল পুরাণো ধরণের। কোনও রূপ পরিবর্ত্তনের ইহারা ঘোরতর বিপক্ষে ছিলেন। বার্দ্ধক্য জরাজীর্ণ প্রাপ্ত মন্ত্রীর দল, মোসাহেব ও সকলের উপর ক্ষমতার মদিরায় কিন্তু এক নারীর শাসনে চীন সাম্রাজ্য হাঁপাইয়া উঠিল।

মোট কথা কোয়ানসু রাজা হইয়াই রাজত্ব করিতে পারিলেন না। প্রতিপদেই তাঁহাকে বাধা দেওয়া হইত,—কোন কাজই তিনি স্বেচ্ছায় করিতে পারিতেন না।

কোয়ানসু দেখিলেন,—ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যের অঙ্গ হইতে পোর্টআর্থার, টালিয়েনওয়ান, ফরমোজা খসিয়া পড়িতে লাগিল,—তিনি উহার বিরুদ্ধে একটি কথা বলিতে পারিলেন না। প্রতিদিন বিজাতীয়ের নিকটে স্বদেশবাসীর লাঞ্ছনা চক্ষুর সম্মুখে ঘটিয়া যাইতেছে, প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই—অথচ তিনিই সে দেশের রাজা।

কিন্তু প্রাণে যাহার প্রকৃতই আঘাত লাগে, সে একবার না হৌক—দুইবার না হৌক,—তিনবারের বার নিশ্চয়ই সাড়া দিবে। এই অত্যাচার অবশেষে এতই অসহ্য হইয়া উঠিল যে কোয়ানসু অবশেষে কহিলেন "এই ক্ষমতাহীন রাজত্ব করার চেয়ে আমি এই অভিনয় ত্যাগ করিয়া যাইব। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে আঘাত করিয়া যাইতে ছাড়িব না। শাসনের নামে যে অভিনয় হয় ইহাকে আমি চূর্ণ করিব। মৃত্যু আসুক—মরণকে ডরাই না,—মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার এই রঙ্গভূমি ছাড়িয়া যাইব। মৃত্যুর সঙ্গে আমার এই লক্ষ লক্ষ প্রজা বুঝিতে পারিবে—আমি তাদের কি ছিলাম। এ রাজত্ব নয়—এ পরের দাসত্ব—এই ভগ্ন সিংহাসনে আমি তার যন্ত্র পুত্তলি। চীন একে একে আনাম মাঞ্চুরিয়া, কিয়াচাউ পোর্টআর্থার হারাইয়া ফেলিল,—আমার কাতর ক্ষীণ প্রতিবাদ কেহ শুনিল না। আজ আমার

জীবন অসহ্য হইয়াছে। আমি জীবন দিয়া সাম্রাজ্য রক্ষা করিব।" সম্রাট কোয়ানস্যু রাজ্যের সমস্ত দিকে সংস্কারের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া দিলেন। তাঁর উৎসাহ শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। রাণী ইহোনালা,—যাঁর ভয়ে সমস্ত চীন সাম্রাজ্য কম্পিত,—যুবক কোয়ানস্যু আজ নির্ভয়ে সেই কৌশলময়ী নারীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। পুরাতন পরীক্ষা লইবার প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইল। তার পরিবর্ত্তে নূতন রকমের পরীক্ষার প্রথা প্রচলিত হইল। তাহাতে ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি উচ্চদরের বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা হইত। কোয়ানস্যু অতঃপর মাঞ্চুসৈন্যের সংস্কার করিতে মনস্থ করিলেন। কিসে প্রজাদের দুঃখদৈন্য দূর হইবে, কিসে তাঁহারা জগতে জাতি হিসাবে সম্মান লাভ করিবে তাহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। তিনি কলেজ ও হাইস্কুল খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারসাধনে মনোযোগ প্রদান করিলেন। অপর পক্ষে, সমস্ত চীনসাম্রাজ্য রাজকীয় সংবাদপত্র পরিচালনার কল্পনাও তাঁহার মনে উদিত হইল। সাধারণে জ্ঞান বিস্তার করিবার জন্য এই প্রস্তাব স্থিরকৃত হইল। রাজধানী পিকিনে রেলওয়ে ও খনির কোম্পানী স্থাপিত করিবার সঙ্কল্প চলিতে লাগিল।

বিদেশী সাহিত্য হইতে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক অনুবাদিত করিবার জন্য পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে নিয়োজিত করা হইল। সৈন্যের আমূল সংশোধন করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। মোটের উপরে চীনদেশে মাঞ্চু রাজত্বে মাঞ্চুরা যাহা হেলা করিয়া নষ্ট করিয়াছেন, এবং যাহা বিদেশীর জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে লওয়া যাইতে পারে,—কোয়ানসু তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

সম্রাটের এই নবীন উৎসাহ দেখিয়া, সংস্কার সাধন প্রয়াসী চীনাদের প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। যখন রাণী ইহোনালা কোয়ানসুর এই অবিচলিত সংকল্পের কথা জানিতে পারিলেন,—তিনি শুধু মনে মনে ইহার বিরুদ্ধে সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন—বাক্যে কিংবা আচরণে বাহিরে তাহা কিছুই প্রকাশ পাইল না। একদিকে তিনি সম্রাট কোয়ান-সুকে এই কার্য্যের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন অন্যদিকে কোয়ানসুকে অপদস্থ করিবার আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়া রহিলেন। কোয়ানসু যে কার্য্যে হাত দেন রাণীর কর্ম্মচারী ও চরেরা পাকে চক্রে তাহাতে বিঘ্ন ঘটাইয়া দেয়। রাণী তলে তলে সম্রাটের বিরুদ্ধে মাঞ্চুদের মন বিষাক্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। অবশেষে মাঞ্চুরা

কোয়ানস্যুর এই নবীনতন্ত্রের সংস্কারে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। অবশেষে তাহারা কহিল—"সম্রাট কোয়ানস্যুকে আমরা চাই না, রাণীই আসিয়া আবার রাজ্য শাসন করুন।" রাণী কিন্তু আসিলেন না,—আসিয়া রাজ্যের 'অসংযত' রশ্মি সংযত করিয়াও ধরিলেন না। তিনি বাহিরে নির্ব্বিকার রহিলেন। অবশেষে যখন কোয়ানস্যু কতিপয় কর্ম্মচারীর অনাবশ্যক পদ বিলুপ্ত করিয়া দিলেন,—তখন ভীষণ বেগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কোয়ানস্যু তাঁর আসন্ন বিপদ উপলব্ধি করিতে পারিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি ভয় পাইলেন না। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, যতদিন কর্ম্মক্ষেত্রে এই ক্ষমতাময়ী নারী প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবস্থিত রহিবেন ততদিন কোন কাজই সফল হইবে না। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে রাণী ইহোনালাকে কারাগৃহে বন্দী করিয়া রাখিবেন এবং তার প্রিয়তম যোদ্ধা জুংলুকে হত্যা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রের পথ পরিষ্কৃত করিয়া লইবেন। জুংলু ইতিমধ্যে যে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল সম্রাট সে সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন।

কিন্তু সম্রাটের দুর্ভাগ্য, চীন সাম্রাজ্যের দুর্ভাগ্য, মাঞ্চুবংশের দুর্ভাগ্য সম্রাটের এই আয়োজন রাণী ইহোনালা জানিতে পারিলেন। রাজ্যের প্রধান অমাত্য ইয়ানসিকাই

সান ইয়াৎ সেন

(ইনি পরবর্ত্তীযুগে চীনগণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন) এর সহিত কোয়ানস্থ এই চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ইয়ানসিকাই নিমকের সম্মান রাখিলেন না,—রাণীর নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ কোয়ানস্থ বন্দীকৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন,—মাঞ্চুদের চিরাকাঙ্ক্ষিত রাণী ইহোনালা পুনরায় চীনসাম্রাজ্যের কর্ণধার হইলেন।

স্বাধীনতা প্রয়াসী চীনাদিগের যে সামান্য আশাটুকু ছিল—তাহাও ফুৎকারে নিভিয়া গেল।

(৭)

সান ইয়াৎ সেন বিদেশে,—কিন্তু তাঁর প্রাণপ্রিয় দেশবাসী তাঁর কাজ তাঁর নির্দ্দেশ মত করিয়া চলিয়াছেন। যখন সুযোগ পাওয়া গিয়াছে, তখন তাঁরা মাঞ্চু সাম্রাজ্যকে একটু নাড়া না দিয়া ক্ষান্ত রহেন নাই। এই ভাবে দক্ষিণ চীনের আনাম রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ হইতে একদল সৈন্য বাহির হইয়া কোয়াংসি ও কোয়াংটান প্রদেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। ক্যানটনের অনতিদূরে যখন তাহারা আসিয়া পড়িল, তখন সরকারী সৈন্য তাহাদের গতিরোধ করিল। তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ক্যানটনের সরকারী অস্ত্রাগার অধিকার করা। স্থানীয় অধিবাসীরা তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ত্রুটি করে নাই,—ইহাদের আগমনে দেশের চারিদিকে একটা আনন্দের উৎস বহিল কিন্তু প্রত্যেকবার যে রকম হয়—এবারও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না। বিদ্রোহীদের গুলিগোলা নিঃশেষ হইয়া গেল—তাহারা পশ্চাৎ ফিরিতে বাধ্য হইল।

সান যেখানেই থাকিতেন সর্ব্বদা দেশের খবর পাইতেন। দেশের জন্য তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদিত।

জন্মভূমি হইতে বিদায় লইয়া তিনি হুনুলুলুতে গমন করেন। এই সময়ে তিনি সর্ব্বদা সশঙ্কিত ও থাকিতেন। কখনো জাপানী বেশে, কখনো সামান্য ভিখারীর বেশে নানা ছদ্মবেশে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি ইতিমধ্যে তাহার বেণী কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি এভাবে বেড়াইতেন যে, তাঁহার প্রিয় শিক্ষক ডাক্তার ক্যানটাইল তাঁহাকে একদিন হুনুলুলুতে দেখিয়া চিনিতে পারেন নাই। ডাক্তার ক্যানটাইলের নিমন্ত্রণে তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন।

স্বদেশে বাস করিবার কালে তিনি চীনদেশে সর্ব্বত্র নবীন সংস্কারের সংবাদ লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। গ্রামে গ্রামে তাঁর সংস্কারের বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন। পার্ল নদীর উপত্যকায় শত সহস্র নরনারী তাঁর কথা শুনিবার জন্য সমবেত হইত। কোয়ানসি ও কোয়ানটাং প্রদেশে তাঁর প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। বিরাট ইয়াংসি নদের উভয় কূলের বিস্তৃত প্রদেশে তিনি তাঁর স্বাধীনতার বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আর বিদেশে, মালয় উপকূলে শত শত চৈনিক শ্রমিক তাঁর এই বার্ত্তা

কাণ পাতিয়া শুনিত। সান ইয়াৎ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া এই সমস্ত প্রচার কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। শুধু দরিদ্র মজুর নহে, যেখানে যত বড় বড় চীনা ধনী মহাজনেরা ছিলেন তাহারাও তাঁহার কথা বেদবাক্য বলিয়া মনে করিতেন। পেনাং ও সিঙ্গাপুরের ঐশ্বর্য্যশালী ব্যবসাদারেরা এই দরিদ্র স্বদেশবাসী সানইয়াতের একটি কথায় চীনের মুক্তির জন্য হাজার হাজার অর্থ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁদের উৎসাহে সানইয়াৎ যেন নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছিলেন। হুনুলুলু, সানফ্রানসিসকো, যুক্তরাজ্য যেখানে যেখানে তিনি গমন করিয়াছেন,—তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁর অপূর্ব্ব মনীষা তাঁর বক্তৃতার অমৃতময়ী বাণী সকলকেই চীনের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে ও কায়মনোবাক্যে সানের সাহায্য করিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি সমস্ত জগতে তাঁর বাণী প্রচার করিতে লাগিয়া গেলেন। জাপান, হুনুলুলু, আমেরিকা যেখানে যেখানে চীনদেশের বাস আছে, সেইখানেই তিনি তাঁর অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিলেন। তিনি যখন বক্তৃতা করিতেন—ধীর স্থির শান্ত সঙ্গীতের মত তাহা শুনাইত। সমস্ত শ্রোতা স্থিরচিত্তে আগ্রহের সহিত তাঁহার বাণী শ্রবণ করিত।

তিনি যেখানে গিয়াছেন, মাঞ্চু সম্রাজ্ঞীর গুপ্তচর তাঁর পিছনে পিছনে ছায়ার মত চলিয়াছে। সকল সময়ে তাঁর গতিবিধির কথা সম্রাজ্ঞীর কর্ণগোচর হইয়াছে। যখন তিনি ১৮৯৬ সালে নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডন যাত্রা করিলেন,—চীনের রাজদূত লণ্ডনে বসিয়া সে খবর পাইলেন। তাই, জাহাজ হইতে লণ্ডনের উপকূলে নামিতেই চীন রাজদূতের আদেশে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাজদূত ভবনে লইয়া যাওয়া হইল। তখন অক্টোবর মাস। সানইয়াৎ এই আকস্মিক বিপৎপাতে নিরুৎসাহ হইলেন না। তখন তাঁর ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক ডাক্তার ক্যানটাইল লণ্ডনে ছিলেন। সান ভাবিতে লাগিলেন কি করিয়া ক্যানটাইলকে এই খবর দেওয়া যায়। যতই দিন যাইতে লাগিল, তিনি ততই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কারণ যদি চীনাগভর্ণমেণ্ট একবার তাঁহাকে জাহাজে চড়াইয়া পিকিনে চালান দিতে পারে তবে চীনসম্রাজ্ঞীর এত চেষ্টা এত প্রয়াস সব পূর্ণ হইয়া যাইবে। রাজদূতভবনে একটি ইংরেজ রমণী দাসীবৃত্তি করিত। সান ইয়াৎ কোন রকমে তারই মারফতে ডাক্তার ক্যানটাইলকে সংবাদ পাঠাইলেন। ডাক্তার এই সংবাদ পাইয়াই মেরিলিবোন থানায় ও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গমন করিলেন। সুসভ্য ইংরেজের রাজ্যে এক অসহায় নির্দ্দোষী

চীনাম্যান কেন অন্য একজন চীনাম্যানের নজরবন্দী হইয়া থাকিবে? চীনদেশ হইলে হয় ত কোন দোষ ছিল না। কিন্তু ইহা যে ইংরেজের খাস রাজত্ব; ইহারই বুকের উপরে এই অত্যাচার! কিন্তু পুলিশকে এই ব্যাপারের সত্যতা বুঝান ডাক্তারের পক্ষে কিছু কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। পুলিশ ডাক্তারকে গৃহে যাইয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে উপদেশ প্রদান করিল। কিন্তু তাহারা জানিত না—যে সানইয়াৎ কে, ভবিষ্যতে তিনি কি হইবেন—আর ডাক্তারের সহিত সানের কি গভীর সম্বন্ধ! পুলিশ কিছুই করিল না। হতাশ হইয়া ডাক্তার পররাষ্ট্রসচিবের কার্য্যালয়ে এক কর্ম্মচারীর নিকট সমস্ত ব্যাপারের গোচর করিলেন। সেই কর্ম্মচারী অনেক তদ্বির করিয়া ডাক্তারকে জানাইলেন যে, যাহাকে বন্দী করা হইয়াছে, সে একটা পাগল বিশেষ। কিন্তু যখন ডাক্তার সমস্ত ব্যাপার বিশদভাবে তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, তখন সেই কর্ম্মচারী এই ঘটনা উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট বিবৃত করিলেন। অবশেষে প্রধান মন্ত্রী লর্ড স্যালিসবারি এই ব্যাপারের বিষয় তদন্ত আরম্ভ করিলেন। প্রধানমন্ত্রীর তদন্তে চীনরাজদূত অগত্যা সান-ইয়াৎকে মুক্তি দিলেন। মুক্তি পাইয়া সানইয়াত ডাক্তার ক্যানটাইলের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

চীন সম্রাজ্ঞী এই সংবাদ পাইয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা সানইয়াতের মস্তকের জন্য ঘোষিত হইল। কিন্তু কিছুতেই সান তার সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না। কতবার তিনি মৃত্যু মুখে পড়িতে পড়িতে যে বাঁচিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্বা নাই। তাই, স্বদেশে বাস করিবার সময় তিনি নিরাপদ হইবার জন্য প্রায় সময়ই চীনা নৌকা জাঙ্কে বাস করিতেন। একদিন যখন তিনি নানকিনে এই প্রকার একটি জাঙ্কে বাস করিতে ছিলেন তখন এক ব্যক্তি তাঁহার কেবিনে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নির্ভয়ে কহিল—তোমায় বধ করিতে পারিলে আমি পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার পাইব সুতরাং মরিবার জন্য প্রস্তুত হও। লোকটির হাতে শানিত অস্ত্র রহিয়াছে,—সান কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। লোকটিকে কহিলেন—"বেশ ত। আমায় হত্যা করিবে,—তাতে আর বাধা কি, আমায় বধ করিতে কতক্ষণ লাগিবে? কিন্তু মরিবার পুর্ব্বে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; তোমার ত' এতখানি বয়স হইয়াছে, তুমি এতদিন পর্য্যন্ত দেশের জন্য কি করিয়াছ? দেশের খাবার, দেশের জল, দেশের সমস্ত জিনিষ ত পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিয়াছ—কিন্তু তার পরিবর্ত্তে দেশকে কিছু দিয়াছ কি?" এই বলিয়া তিনি

তাহার সহিত দেশের সম্বন্ধে জাতির সম্বন্ধে নানা তর্ক তুলিলেন,—অবশেষে সেই লোকটি যখন বুঝিতে পারিল যে, সে সানকে হত্যা করিতে আসিয়া নিজের এবং দেশের সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে, তখন সে অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া সানের পা জড়াইয়া ধরিল। আকুল হইয়া কহিল—"আমায় ক্ষমা করুন। আমি বড় অপরাধ করিয়াছি।" অবশেষে অনুতপ্ত হইয়া এই লোকটি গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার নিবারণ করিয়াছিল।

আর একদিন ক্যানটন নগরের বাহিরে সান একটি জেলের কুটীরে লুকাইয়া ছিলেন। তাঁহাকে এই রকম করিয়া এখানে সেখানে লুকাইয়া মাথা বাঁচাইয়া এদানীন্তন চলিতে হইত। তাঁহাকে আটক রাখিবার জন্য ও সুবিধা পাইলে গুলি করিয়া মারিবার জন্য সৈন্য প্রেরিত হইল। দুঃসময়ের বন্ধু সেই দরিদ্র জেলে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া সানকে দুই দিন তার কুটীরে লুকাইয়া রাখিল! অবশেষে, দুইদিন পরে সানের কতিপয় বন্ধু আসিয়া এই সৈন্যদের যুদ্ধে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিল!

এইরূপ পথে ঘাটে যেখানে সেখানে অজস্রবার সান ইয়াতের জীবন বিপন্ন হইয়াছে। তথাপি তিনি মুহূর্ত্তের জন্য আপনার স্থির পথ হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই।

তখন তিনি হাইনান দ্বীপে বাস করিতেন। শত্রু পক্ষের সৈন্যরা তাঁর গতিবিধির পরিচয় পাইয়া সেই বাড়ী ঘেরাও করিয়া ছয়মাস তাহাকে সেইখানে আটক করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কোনও অদ্ভুত কৌশলে তিনি ছয়মাস পরে তাহাদের হাত এড়াইয়া জলপথে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভগবানের কৃপায় তিনি প্রতিবারই সমস্ত বিপদ এড়াইয়া চলিয়া গিয়াছেন।

সেইবার তাঁহাকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। ক্যানটন সহরে তিনি নিজের ঘরে বসিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকাল। দুইজন সরকারী সেনানী কতিপয় সৈন্য লইয়া তাঁর গৃহে প্রবেশ করিল। সান ইয়াৎ একা— নিরুপায়। অন্য কেহ হইলে কি করিত বলা যায় না, কিন্তু সান এই আসন্ন বিপদে জ্ঞানহারা হইলেন না। তিনি একটুও বিচলিত না হইয়া টেবিলের উপর হইতে ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল লইয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পরম শত্রুরা কাণ পাতিয়া তাহা শুনিতে লাগিল,— অবশেষে সান ইয়াতের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের নানা প্রশ্ন ও তর্কবিতর্ক উঠিল। সান তাহাদের সহিত ক্রমশঃ আলাপ জমাইয়া তুলিলেন। দুই ঘণ্টার পরে এই রকম আলোচনা তর্কবিতর্ক করিয়া সৈন্যদল চলিয়া গেল,—সানকে

বন্দী করিতে আসিয়া নিজেরা সানেরা কথায় মজিয়া গেল। ফিরিয়া যাওয়ার সময় তাহাদের মনে হইল না—যে, তাহারা সানকেই হত্যা করিতে আসিয়াছিল। অদ্ভুত সানের ক্ষমতা!

এইরূপে ১৮৯৫ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত,—এই ১৭ বৎসর যাবৎ মৃত্যু সানের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছে—কিন্তু সান নির্ভীক অটল হইয়া মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন।

(৮)

গত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে চীনে সংস্কার প্রার্থীরা শেষবার চেষ্টা করিলেন। সে রকম আয়োজন আর কখনো হয় নাই। তখনও সান ইয়াৎ বিদেশে রহিয়াছেন। ইয়াংসি নদের তীরে উচাং এ, হ্যাংকাওর নিকটে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ, চীন গভর্ণমেন্ট বিদ্রোহভাবাপন্ন কতকগুলি সৈন্যদলের অস্ত্র কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। গভর্ণমেন্টের ধারণা, হইয়াছিল যে, সৈন্যদলে বিদ্রোহের বীজ প্রবেশ করিয়াছে। চীনের প্রধান অমাত্য ইয়ানসিকাই তখন চীনের গভর্ণমেণ্টে সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। ইউরোপীয় শিক্ষায় তিনি তাঁর সৈন্যদলকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কার প্রার্থী ছিলেন,—কিন্তু মাঞ্চুবংশের উচ্ছেদ সাধন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিল। তাই, সংস্কারের প্রয়াসী সম্রাট কোয়াংসু যখন সংস্কারের চেষ্টা দেখিতেছিলেন, ইয়ানসিকাই তখন পর্য্যন্ত তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন যুবক সম্রাট্ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া সাম্রাজ্ঞীর প্রাণের উপর হাত দিতে চেষ্টা পাইলেন,—তখন তাহা ইয়ানসিকাইএর অসহ্য

বোধ হইল। তাই তিনি পরিশেষে সম্রাট্ কোয়ানসুর সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এহেন ইয়ানসিকাই ছিলেন চীন-সৈন্যের প্রধান নায়ক। ১৯১১ সালে চীনের সৈন্য সংখ্যা ছিল, প্রায় ১৩০০০০ জন। ইহারা সকলেই ইউরোপীয় তন্ত্রে শিক্ষিত। অপরদিকে নৌবিভাগেরও যথেষ্ট উন্নতি ইয়ানসিকাই সাধিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিরাট সুশিক্ষিত সৈন্যদল সাম্রাজ্যের রাজ্ঞীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল না। সান ইয়াৎসেনের মুক্তির বাণী ইহাদিগের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। যদি এই সৈন্যদল চিরদিন রাজার অনুরক্ত হইয়া থাকিত, তবে সংস্কারপ্রয়াসীদিগের কখনো মাঞ্চুসাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করিতে সাধ্য থাকিত না। জানুয়ারী মাসে সানইয়াৎ সংবাদ পাইলেন যে, এই বিরাট-সৈন্যদলের প্রায় তৃতীয় চতুর্থাংশ তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত আছে। ইহা সানের কর্মীবৃন্দের প্রচার কার্য্যের ফল। সান শুনিয়া খুসী হইলেন। ওদিকে গভর্ণমেণ্টও সৈন্যদলের এই মনোভাব অবিলম্বে জানিতে পারিলেন। তাই, যাহাকে সন্দেহ হইল তাহাকেই সৈন্যদল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। নানকিনে ও অন্যান্য স্থানে এই অস্ত্রগ্রহণ ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে সংঘটিত হইয়া গেল। হ্যাংকাও ও উচাংএ দুইটি রেজিমেণ্টকে এই ভাবে অস্ত্রচ্যুত

করা হইল, কিন্তু তথাকার তৃতীয় রেজিমেণ্ট অস্ত্রপরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিল। আগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

বিপ্লব আরম্ভের নির্দ্ধারিত দিবসের ৬।৭ মাস পূর্ব্বেই বিদ্রোহ প্রকাশ পাইয়া গেল। সান তখন বিদেশে,—আমেরিকায়। এই সংবাদ পাইয়া তিনি বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কি করিয়া প্রশান্ত মহাসাগর পার হইবেন তাহা ভাবিয়া পাইলেন না,—সর্ব্বদা তাঁর পিছনে তখনো গুপ্তচর লাগিয়া রহিয়াছে। তখন তিনি প্রশান্তমহাসাগর পার হইবার আশা ত্যাগ করিয়া নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডনে পুনরায় আগমন করিলেন। বিখ্যাত আমেরিকান সেনাপতি জেনারেল হোমারলি সানের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনিও সানের সহিত লণ্ডনে গমন করিলেন। লণ্ডন হইতে চীনদেশে গমন করিবেন এই ছিল সানের অভিলাষ। তখন সানইয়াতের নাম অনেকেই জানিয়াছে, শুনিয়াছে—তাই, লণ্ডনে আসিয়া পরিচিত হইতে সানের খুব বেগ পাইতে হইল না,—তিনি অবাধে বড় বড় লোকের সহিত আলাপ করিলেন। এখন তাঁর সম্মান কত! আর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রথম যখন তিনি লণ্ডনে আসিয়াছিলেন—তখন তাঁহাকে উন্মাদ আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। এমনই জগৎ!

ততদিনে চীনদেশে যুদ্ধ হইয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঞ্চু সম্রাজ্ঞী নিজের ইচ্ছায় রাজ্যের শাসনভার ত্যাগ করিলেন। চীনদেশে চীনগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। সমগ্রদেশে যেন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল। চীনেরা একদিনে তাহাদের বহু শতাব্দীর স্মৃতিমাখা বেণী কাটিয়া ফেলিলেন, একদিনে বহুদিনের অভ্যাসগত আফিং পরিত্যাগ করিলেন।

সান ইয়াৎ সে সময়ে ডাক্তার ক্যানটাইলের গৃহে বাস করিতেছিলেন। একদিন সান বাড়ীর বাহিরে গিয়াছেন,— এমন সময় সানের নামে সাঙ্কেতিক ভাষায় একখানা টেলিগ্রাম আসিল। বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া সান টেলিগ্রামখানি পড়িয়া পকেটে রাখিয়া দিলেন। তাঁহার মুখে কোন ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। ডাক্তার ক্যানটাইল জিজ্ঞাসা করিলেন "টেলিগ্রামে কি লেখা আছে সান?" সান মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"ও কিছু নয়, যুদ্ধে আমাদের জয় হইয়াছে। চীনগণতন্ত্র আমাকে গণতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।" এত সরলভাবে সান কথা কয়টি বলিলেন যে, উহাতে কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না।

ডাক্তার অবাক হইয়া তাঁর এই প্রিয় শিষ্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এমন ছাত্রের যে তিনি গুরু ইহা

ভাবিয়া ডাক্তার ক্যানটাইল যথার্থ গৌরবান্বিত বোধ করিলেন।

১৯১১ সালের ২০শে নভেম্বর তারিখে সান লণ্ডন ত্যাগ করিয়া প্যারিসে গমন করিলেন। সিঙ্গাপুরে তাঁর দেশবাসী তাঁর অভ্যর্থনার জন্য আগাইয়া আসিয়াছিল। প্যারিস হইতে সান সিঙ্গাপুরে গমন করিলেন, সেখানে সান ইয়াতকে পাইয়া চীনজাতি যে জয়ধ্বনি করিয়াছিল—এমন জয়ধ্বনি বোধহয় বহুদিন চীনজাতির কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হয় নাই। সেই অভ্যর্থনায় চীনের ঘরের মেয়েরাও অনেকে আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। সিঙ্গাপুর হইতে সান হংকং এ অবতরণ করিলেন। এই হংকং হইতে তিনি বহুদিন নির্ব্বাসিত,—বহুদিন পরে স্বদেশের মূর্ত্তি দেখিয়া সানের হৃদয়ে সত্যই আনন্দের প্রবাহ বহিয়াছিল। হংকং হইতে তিনি সাংঘাই বন্দরে প্রবেশ করিলেন—এখানে তাঁহাকে বিরাট অভ্যর্থনায় অভিনন্দিত করা হইল। রিফর্ম্মের সাময়িক গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নানকিনে প্রেসিডেণ্ট পদে বরণ করিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রথমতঃ সান ইয়াৎ এই পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন কিন্তু অবশেষে জনমতের অনুরোধে তাঁহাকে স্বীকৃত হইতে হইল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভূতপূর্ব্ব সম্রাট কোষ্ঠানস্থ রাণীর অনুচর

কর্তৃক বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। সেই স্থানেই তাঁর মৃত্যু হইল। কোয়ানসুর পতনের পরে রাণী দেখিলেন, তিনি বড়ই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, তাই প্রিন্স চু'ন এর আর এক শিশুপুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শিশু সম্রাটের নাম সুয়াংটাং।

১৯১১ সালে যখন গণতান্ত্রিকেরা জয়লাভ করিলেন, তখন এই শিশু-সম্রাটকে সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করা হইল। শিশু রাজা এখনও জীবিত আছেন, কিন্তু রাণী ইহোনালা আর নাই!

(৯)

দীর্ঘ বৎসরগুলি একে একে চলিয়া গিয়াছে,—ইয়াংসি নদের তীরে উচাং নামক স্থানে ১৯১১ সালে যেদিন রণভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল, যেদিন ক্ষাত্রশক্তি চীনের জনমানবের মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রবল পরাক্রান্ত মাঞ্চুবংশের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল,—সে আজ বহুদিনের কথা! এই দীর্ঘ কাল ধরিয়া চীন গণতন্ত্রের সুশীতল ছায়ায় বাস করিয়া চীন-জাতি কি ভাবে তার জাতীয় জীবনে অগ্রসর হইয়াছে, আমরা এখন তাহাই দেখিতে চেষ্টা পাইব। সেই সময় হইতে এই পর্য্যন্ত ধারাবাহিক কোনও ইতিহাস আপাততঃ পাওয়া যায় না,—নানা সাময়িক সংবাদপত্র হইতে যতটুকু পাওয়া গেল তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রকৃত ভাবে বলিতে গেলে দেখা যায় যে, চীনজাতি এই ১৩।১৪ বৎসর খুব সুখে বাস করিতে পারে নাই। কারণ নবীন গভর্ণমেণ্ট যে শাসন কার্য্যে অক্ষম তাহা ক্রমশঃ শোনা যাইতেছে। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যে ও আর্থিক ব্যাপারে চীন এই কয় বৎসরে এত উন্নতি

করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মাঞ্চু সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করেন। এই সময়ে গণতান্ত্রিকগণের মধ্যে লিইয়ংহুং নামে এক ব্যক্তি বড়ই খ্যাতি ও প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। উচাংয়ের যুদ্ধে তিনি প্রবল বিক্রমে সৈন্য চালনা করিয়া যুদ্ধজয়ের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, যুদ্ধে জয় হইলে তিনি চীন গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবেন, কিন্তু তাহা হইল না। দেশের লোক সানইয়াতসেনকে চাহে, সানই সভাপতি হইলেন। লিইয়ংহুং ইহাতে বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন, সানইয়াৎ ত বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইলেন। যত পরিশ্রম করিলাম আমরা দেশে থাকিয়া। লিইয়ংহুং এর এই ক্ষুব্ধ ভাব পরে দূর হইয়াছিল। কারণ সানইয়াতসেন বেশী দিন প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকেন নাই। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি প্রেসিডেণ্ট হওয়াতে এক সম্প্রদায়ের লোক সুখী হইতে পারে নাই, তারপরে তিনি দেখিলেন যে, তাঁর মত উপযুক্ত ব্যক্তি চীনদেশে তখনও রহিয়াছে, তাই তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলেন। স্বনাম-খ্যাত ইয়াংসিকাই সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। ইয়াং

সিকাইএর পরে লিইয়ংহং এর বহুদিনের আশা পূর্ণ হইয়াছিল,—তিনি সভাপতি হইলেন। তাঁহার কার্য্যকালে চীনদেশে সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

এই সময়ে আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া রপ্তানী যাহাতে বেশী পরিমাণে চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইল। চীন ধীরে ধীরে তাহার আভ্যন্তরিক লুপ্তপ্রায় শিল্পগুলির পুনরুদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রকৃত পক্ষে এই অল্প কয়বৎসরে চীন শিল্পবিস্তার কার্য্যে অসম্ভব উন্নতি সাধন করিয়া ফেলিল। তুলার ব্যবসায় হুহু করিয়া বাড়িয়া চলিল,—নানা স্থানে বড় বড় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল। চীনের বন্দরে বন্দরে সমুদ্রগামী জাহাজ সকল প্রস্তুত হইতে লাগিল; শিল্প জাত দ্রব্য সম্ভার সগর্ব্বে বহন করিয়া চীন জাতি জগতের বাজারে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখন ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। —তাহাতে চীনের ব্যবসার পক্ষে আরও সুবিধা হইল। পূর্ব্বে বিদেশ হইতে সমস্ত দ্রব্য সস্তায় আনীত হইত, বিদেশ হইতে দ্রব্য না আসিলে চীনকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইত। এখন চীনবাসী অর্থের ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়া বড় বড় কোম্পানী খুলিয়া ফেলিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই নিজের দেশের শিল্পজাত দ্রব্য

নিজেদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইয়া দাঁড়াইল। এসমস্ত উন্নতি অনেকটা সানইয়াতের দূরদর্শিতার উপর নির্ভর করিয়াছে। সান যে সমস্ত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছাত্রকে উৎসাহ দিয়া বিদেশে জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন,—তাঁহারা ইত্যবসরে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া দেশের কাজে প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের চেহারা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যে মুদ্রাযন্ত্র একদিন চীন দেশ হইতেই উদ্ভূত হইয়া সমগ্র জগৎকে উপকৃত করিয়াছিল,—সেই ছাপাখানাই আবার নূতন করিয়া চীনদেশে আগমন করিল। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার পিপাসা সঙ্গে সঙ্গে সকলের হৃদয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে গণতন্ত্র অগ্রসর হইতে পারিল না। যে পরিমাণে আর্থিক ও সাধারণ অবস্থার উন্নতি সাধিত হইল,—সেই হিসাবে দেশের রাজনৈতিক আকাশ গাঢ়তর হইয়া উঠিল। গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বিগ্রহ, অসদাচরণ, আইন অমান্য ও গবর্ণমেন্টের কাজকর্ম্মের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা গেল। হইতে পারে গণতন্ত্রের কর্ম্মপদ্ধতিতে দোষ ছিল না,—কিন্তু গণতন্ত্র যে প্রবল হস্তে শাসনদণ্ড ধারণ করিতে পারেন নাই তাহা পরবর্ত্তী অবস্থাতেই

প্রকাশ পাইয়াছিল। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন যে, এই প্রকার গোলযোগের মূলে রহিয়াছে—চীন জাতির কর্ম্মে অক্ষমতা এবং শিক্ষার অভাব। চীন জাতি এত সুশিক্ষিত ও উপযুক্ত এখনও হয় নাই যে সুব্যবস্থানুসারে গণতন্ত্রের কার্য্য চালনা করিতে সক্ষম হইবে,—ইহা তাহার প্রতি কর্ম্মের দিকে চাহিলেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

কিন্তু চীন দেশের প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিই বুঝিতে পারিয়াছে যে, সংস্কার না হইলে এই পুরাতন সভ্যতার অট্টালিকা একদিন ভূমিস্মাৎ হইবে। কিন্তু এই সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর যাবৎ গণতন্ত্রের ভার বহন করিয়া সকলেই জানিতে পারিয়াছে যে, চীন জাতির এখনও অনেক কিছু শিক্ষা করিবার রহিয়াছে। পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা, নেতৃত্বের ক্ষমতা, দেশের গঠনকার্য্য প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা যে চীনের নাই অথবা থাকিয়াও তাহার স্ফুরণ সে দেখাইতে পারে নাই—তাহাই বারে বারে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। কারণ, মাঞ্চুরাজত্বে যে অরাজকতা, যে অনিয়ন্ত্রিত রাজকার্য্য প্রচলিত ছিল—গণতন্ত্রের যুগে তাহা হইতে অবস্থার তেমন উন্নতি হয় নাই

ইউরোপের কর্ত্তারা চিরকালই সকলের উপর মুরব্বিয়ানা করিয়া আসিয়াছেন। ‘চীন জাতি—আহা, দুর্ব্বল

বেচারীরা! আমাদের সকলেরই ইহাকে সাহায্য করা দরকার।' ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে টেপিং বিদ্রোহের সময় চীনের দক্ষিণ অংশে যখন হংসিউচুয়ানের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা চীন রাজার ক্ষমতাকে উপেক্ষা করিয়া জয়লাভ করিয়াছিল, তখন চীনের এই ঘরোয়া বিবাদ দেখিয়া সুবিধা পাইয়া ইংরেজ ও ফরাসী চীনের উপকূলে বাণিজ্য করিতে আসিলেন। তারপরে, প্রায় বহু বৎসর নড়িয়া চড়িয়া চীনে নানা ভাবে তাঁহারা বাণিজ্য বিস্তার করিয়া ফেলিলেন। এবং যখন চীনের মাঞ্চু রাজা তাঁর প্রজার সহিত বিবাদে মত্ত তখন তাহারা সুযোগ বুঝিয়া চীনের রাজধানী পিকিন নগর আক্রমণ করিলেন। এই সব কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই যুদ্ধের নাম বক্সারের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে চীন অধিবাসী ইংরেজ ও ফরাসীর হস্তে কম লাঞ্ছনা ভোগ করে নাই! চীনেরই মাটার উপর দাঁড়াইয়া ইংরেজ চীনের উপর অত্যাচার করিয়া গিয়াছে—দুর্ব্বল চীন তার প্রত্যুত্তর দিতে তখন সমর্থ হয় নাই। আজ সে সময় আসিয়াছে। আমরা ক্রমশ তাহা দেখাইতে চেষ্টা পাইব।

ইংরেজ তখন চীনের ওয়াইহাইওয়ে নামক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চীন সাম্রাজ্যে যাদুমন্ত্রে আফিংএর ব্যবসা চালাইয়াছিলেন। আফিং খাইয়া

চীন ঘুমাইয়া পড়িল। ফ্রান্স মুচকি হাসিয়া ঘুমন্ত চীনের হাত হইতে ছোঁ মারিয়া ফৌচাউ দখল করিয়া লইলেন! গোঁফ চুমড়াইয়া জার্ম্মেণী আসিয়া জোর করিয়া কিয়াচাউ অধিকার করিলেন! কিয়াচাউয়ে জার্ম্মাণীর প্রকাণ্ড দুর্গ সগর্ব্বে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন আমেরিকা ভাবিলেন— আমিই বা কেন বাদ যাই!—আমেরিকা চিরকালই উদার নীতিক (?) বলিয়া নিজেদের ঘোষণা করিয়া থাকেন—তাই তাঁহারা মন্তব্য স্থির করিলেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র যখন সকল মানবের যাতায়াতের অধিকার আছে, তখন চীন কেন আমেরিকাকে চীনদেশে বাণিজ্য করিতে দিবে না। (আর সেদিন এই আমেরিকা আজ স্বার্থের বশে এই মন্তব্য পাশ করিয়াছে,—এসিয়াবাসীর যুক্তরাজ্যে প্রবেশ নিষেধ —বিশেষ করিয়া জাপান ও চীনের।) চীনের উপকূলে, বন্দরে বন্দরে আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংরেজ ও জার্ম্মেণী অবাধে বাণিজ্য করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। চীনদেশের যেন আর মালিক নাই। অবস্থা তখন এত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরভূমি যেন একপ্রকার বৈদেশিকের করায়ত্ত হইয়া রহিল। অথচ চীন সম্রাট ইহার বিরুদ্ধে সহসা কিছু বলিতে কিংবা কিছু করিতে সাহস পাইলেন না। এই সমস্ত

স্থানে বিদেশীয়দিগের অপূর্ব্ব প্রভুত্ব—চীনারা সেখানে যেন পরের দেশে বাস করিতেছে বলিয়া মনে হয়। শ্বেতকায় জাতি পীতজাতিকে পশুর অধম বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। নিজের দেশে, নিজের স্বাধীন দেশে নিতান্ত দুর্ব্বল না হইলে এই ব্যবহার জগতের কোন জাতি সহ্য করিয়া থাকিতে পারে না। প্রাচ্যজাতি চিরদিনই প্রতীচ্যকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু প্রতীচ্য কহে—"আমার মেসিনগান, আমার এয়ারোপ্লেন, আমার সাবমেরিন থাকিতে—কার সাধ্য আমার অধিকার হইতে আমায় বঞ্চিত করে!" সত্যকথা!

ইংরেজ ফরাসী এই ভাবে চীনের জমি অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না,—অনন্ত পিপাসা তাদের। কি করিয়া চীনের রেলপথগুলি একে একে তাহাদের হাতে আসে তাহার জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। এইরূপে ধীরে ধীরে বিজাতীয় শ্বেতজাতি শান্তির পথ অবলম্বন করিয়া চীন দেশে আধিপত্য স্থাপন করিতে লাগিল। তাহাদের অধিকৃত স্থান গুলি ক্রমশই সুরক্ষিত করিয়া লওয়া হইতে লাগিল। চীন গভর্ণমেণ্ট জানিয়া শুনিয়াও তাহার বিশেষ প্রতিবাদ করিলেন না। অবশেষে, বিদেশীয়েরা স্পষ্টই ঘোষণা করিয়া দিল যে,—সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান বর্ত্তমানে প্রকৃত

পক্ষে ইউরোপীয় শক্তির—চীনের উহার উপরে কোনও অধিকার নাই।—এই ভাবে বিদেশীয়দের হস্তপুত্তলিকা হইয়া চীন জাতি নীরবে একদিকে রাজার ও অন্যদিকে পরের অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল।

মাঞ্চুবংশ তিরোহিত হইয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে—দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা চীনজাতিকে বিদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন,—নিদ্রোত্থিত চীন তখন বিদেশীয়ের বিক্রম দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাঁহাদের ভয় হইল,—হয়ত বা বিদেশী আসিয়া সমস্ত দেশটাকে অধিকার করিয়া বসিবে। চীন গণতন্ত্র এই দিকে খুব সজাগ হইয়া রহিলেন—বিদেশীয়দের অত্যাচার কিছু দিনের নিমিত্ত কমিয়া গেল।

ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইংরাজ ফ্রান্স জার্ম্মাণী চীনা রঙ্গক্ষেত্র হইতে সরিয়া ইউরোপের রণক্ষেত্রে যুদ্ধে মত্ত হইল। কিছু কালের জন্য চীন নিশ্চিন্ত রহিল, কিন্তু বাড়ীর পাশে জাপান ততক্ষণে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। সে চীনেদের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল,—পাশ্চাত্য রঙ্গভূমি হইতে ফিরিয়া আসিয়া বৈদেশিক রাজশক্তিনিচয় আবার প্রশান্ত সাগরের উপকূলে সাম্রাজ্য-

প্রতিষ্ঠার জন্য কলরব তুলিল। সে খুব বেশী দিনের কথা নহে।

গত মহাযুদ্ধে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত ইউরোপ জগতের চতুর্দ্দিকে আহারের অন্বেষণে ফিরিতে লাগিল। ইউরোপ বুঝিতে পারিল—চীন দেশের ন্যায় এমন শীকার তার কোথাও মিলিবে না। চীনে কাঁচা মাল যথেষ্ট পাওয়া যায় ;—শিল্পজাত দ্রব্যের বাণিজ্যস্থানও চীন। সুতরাং সকলের ব্যগ্র দৃষ্টি যে চীনের ধনরত্নের দিকে পড়িবে তাহাতে আর বিচিত্র কি!

এতদিনে চীন সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে। এই নবীন জাতিকে আর ভুলাইবার উপায় নাই। বিদেশীয় রাষ্ট্র শক্তিকে ধ্বংস করিয়া তাহাদের সমুচিত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। এই আন্দোলনের নাম কোমিনটাং আন্দোলন। সমস্ত চীন জাতির দেহে বিদেশীয়ের এই শাসন শৃঙ্খলের ব্যথা প্রবল তরঙ্গের ন্যায় আঘাত করিল। লক্ষ-লক্ষ চীন প্রজা একপ্রাণ একমন হইয়া দেশের মুক্তি কামনা করিল। তাহারাই ফলে আজ চীনদেশে আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছে।

জাতির আশা আকাঙ্খা যখন চরম হইয়া উঠে, তখন সে আপনার লাভের আশায় নীচে চারিদিকে চাহিয়া

দেখিবারও অবসর পায় না। বিদেশীর পদানত হইয়া দিন দিন অপমানের বোঝা বহিতে চীন আর রাজী নহে,—এই আকাঙ্খা পূরণের সেই তীব্র অভিলাষ আজ ভীষণ মূর্ত্তিতে যুদ্ধ বিগ্রহে প্রতিফলিত হইয়াছে। এ যুদ্ধ প্রকৃত পক্ষে চীন জাতির মধ্যে বিভিন্নদলের যুদ্ধ নহে—ইহা বিদেশীয়ের সহিত চীনের জাতীয়তার সংঘর্ষ। বর্ত্তমানে চীন গণতন্ত্রের সভাপতি সাওকুন।—পিকিনে গণতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গণতন্ত্রের শাসন ক্ষমতা আজকাল মাত্র পিকিন সহর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জনপদে মাত্র প্রতিষ্ঠিত। ইহার বাহিরে সাওকুনকে কেহ মান্য করে না। সাওকুনের গণতান্ত্রিক সভার প্রধান মন্ত্রীর নাম—ওয়েলিংটনকু। ইনি লণ্ডনে ও ওয়াসিংটনে চীনা রাজদূতপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পিকিনের গণতন্ত্রের দক্ষিণ চীন কিংবা উত্তর চীনের উপর আজকাল কোন ক্ষমতাই নাই। সানইয়াতের প্রতিষ্ঠিত প্রথম গণতন্ত্রের আজ এই অবস্থা। বিশেষতঃ আদিকাল হইতে আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে, চীনদেশের উত্তর ভাগের সহিত দক্ষিণ ভাগের কোন দিনই মিলন হয় নাই। বহু দিন তাহারা একে অন্যের প্রধান শত্রু বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যখন প্রথম সান ইয়াতের নেতৃত্বে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল তখনই কেবল কিছু দিনের

জন্য উত্তর ও দক্ষিণ চীন মিলিত হইয়াছিল। অনেক মাঞ্চু সম্রাটের অদৃষ্টেই ইহার পূর্ব্বে উত্তর ও দক্ষিণ চীন একযোগে শাসন করা ঘটিয়া উঠে নাই। কারণ যত গোলমাল, যত যুদ্ধ বিগ্রহ যত আন্তর্জ্জাতিক আন্দোলন উত্থিত হইয়াছে—চীনের দক্ষিণ ভাগ হইতে। বর্ত্তমানের আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ ও অনেকটা সেই উত্তর ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে বাদানুবাদের ফল। কিন্তু যদি আনুপূর্ব্বিক ঘটনার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তবে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহার মূলে রহিয়াছে,—বিদেশীয় রাজশক্তির চীন জাতির উপরে প্রভুত্ব করিবার প্রবল অভিলাষ এবং সেই অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্র। এই যুদ্ধের এক দিকে প্রকাণ্ড চীন সাম্রাজ্যের প্রত্যেক ক্ষুদ্র প্রজার বিজাতীয়ের প্রতি ঘৃণা, অন্যদিকে বিদেশীয় শাসন শক্তির বিরাট নৌবাহিনী! বিদেশীয়েরা ইতিমধ্যে সাংহাই বন্দরে এত অধিক সামরিক রণসম্ভার আনিয়া ফেলিয়াছে এবং চীন জাতিকে মাঝে মাঝে ভয় প্রদর্শন করিতেছে যে, চীন-জাতি যদি তাদের ঘরোয়া বিবাদ শীঘ্র না মিটাইয়া ফেলে তবে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়া পড়িবে। কিন্তু আশার কথা এই যে, যে মুহূর্ত্তে বিদেশীয়েরা চীন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে সেই মুহূর্ত্তেই চীন জাতি

মোরোয়া বিবাদ মিটাইয়া এক যোগে শত্রুকে আক্রমণ করিবে। কিন্তু বিদেশীয়েরা চীনকে আক্রমণ করিতে কোন্ সুযোগ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। অথচ ১৯২৪ সালের ২৭শে আগষ্ট তারিখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, সাংঘাই বন্দরে আমেরিকা ও ব্রিটিশের আরও যুদ্ধ জাহাজে আসিয়া পড়িয়াছে। এদিকে সাংঘাই বন্দর ও তার পার্শ্ববর্ত্তী ৩০ মাইলের মধ্যবর্ত্তি স্থান—নিরপেক্ষ ভূমি (Neutral Zone) হিসাবে অস্ত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ বলিয়া বিদেশীয় শক্তি ঘোষণা করিলেন। এদিকে চীনের উত্তর বিভাগ ও দক্ষিণ বিভাগ নিজেদের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন।

রাজধানী পিকিন নগরে গণতন্ত্রের সভাপতি সাওকুন ব্যতীত আর একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি থাকিতেন। তাঁর নাম উপেইফো; ইনি চীন রাজপ্রাসাদের মেয়র। পিকিন গভর্ণমেণ্টের উপর ইহার অসাধারণ ক্ষমতা। অন্য-দিকে উত্তর চীন প্রদেশে চাংসোলিন নামে এক সেনাপতি অখণ্ড প্রতাপে বাস করিতেন। চাংসোলিনের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র চীনের উত্তর প্রান্তস্থিত মাঞ্চুরিয়ায়। মাঞ্চুরিয়ার অধিবাসীরা তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করে। মুকডেনে তাঁর রাজধানী। উত্তর চীনে উপেইফো এবং চাংসোলিন

ক্রমশঃ প্রতাপশালী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। সভাপতি সাওকুনকে তাহারা গ্রাহ্য করিতেন না। পরিশেষে এই ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদ্বয় নিজের স্বার্থসাধনমানসে বিদেশীয় জাতিনিচয়ের সহিত ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র স্থাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই দুই জনেরই প্রধান দৃষ্টি রহিল, কি করিয়া চীনের প্রধান শাসন কেন্দ্র পিকিনে নিজের নিজের আধিপত্য স্থির করিতে পারেন। অবশেষে দুই জনের স্বার্থ ও দুই জনের উদ্দেশ্য এবং দুই জনের কর্ম্ম-পদ্ধতি যখন ক্রমশঃ উভয়ে বুঝিতে পারিলেন, তখন পিকিন গভর্ণমেণ্ট হস্তগত করিতে উভয়ে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। পিকিনের উপেইফো এবং মাঞ্চুরিয়ার চাংসোলিনএর মধ্যে বিরোধ বাধিয়া গেল।

এদিকে দক্ষিণ চীনে পিকিন গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ চেকিয়াং প্রদেশের শাসনকর্ত্তা লাউইয়াংসিয়াং বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, পিকিনের গণতন্ত্রের আর কোন ক্ষমতা নাই; বরং ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের তরীখানি উপেইফোর হস্তগত হইতেছে, এবং স্বদেশদ্রোহী উপেইফো বিদেশীয়ের সহিত ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি উপেইফোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সাংঘাই সহরের অস্ত্রাগার

অধিকার করিয়া ফেলিলেন। উপেইফো এই সংবাদ জানিতে পারিয়া লাউ ইয়াংসিয়াংকে যথোচিত শিক্ষা দিবার জন্য চিসিয়ান নামে আর একজন শাসনকর্ত্তাকে সাংঘাইয়ের অস্ত্রাগার পুনরধিকার করিতে প্রেরণ করিলেন। এদিকে মাঞ্চুরিয়ার সামরিক নেতা চাংসোলিন অন্য এক চাল চালিলেন। তিনি উপেইফোর সহিত মিত্রতা করিয়া কৌশলে গণতন্ত্রের শাসনরজ্জু অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। অবিলম্বে উপেইফো চাংসোলিনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপার যখন সংঘটিত হইল তখন সানইয়াৎসেন আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। এতদিন শারীরিক অসুস্থতা এবং রাজনৈতিক মতভেদের জন্য তিনি কিছু দিন বিরাম ভোগ করিতেছিলেন কিন্তু এখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, মাঞ্চুরিয়ার চাংসোলিন ও উপেইফোর সমবেত চেষ্টায় চেকিয়াংএর শাসনকর্ত্তা লাউইয়াংসিয়াংএর পরাজয় অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। পক্ষান্তরে লাউ ইয়াংসিয়াং যে সদভিপ্রায়ে যুদ্ধে নামিয়াছেন তাহাও বিফল হইবে। লাউইয়াং এর পরাজয় হইলে চাংসোলিন ও উপেইফো মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীর বন্ধু স্বজাতির শত্রু চাংসোলিন ও

উপেইফো বিদেশীর সহিত যোগাযোগে দেশটাকে বিদেশীয়ের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিবে। সানইয়াত আর স্থির থাকতে পারিলেন না—তিনি লাউইয়াংসিয়াংএর পক্ষাবলম্বন করিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন। তাহাতে তিনি চীন জাতিকে স্পষ্টভাবে মাঞ্চুরিয়ার চাংসোলিন ও পিকিনের উপেইফোর কীর্ত্তিকলাপ বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, যাহাদের চীন জাতি আজ মাথায় তুলিয়া নাচিতেছে, তাঁহারাই অন্তরে গোপনে বিদেশীয় জাপান, ইউরোপের রাজশক্তিনিচয় ও আমেরিকার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া দেশকে পরের হস্তে সঁপিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। সানইয়াৎ বড় দুর্ব্বল নহেন—দক্ষিণ গভর্ণমেণ্টের মণিস্বরূপ ক্যাণ্টন সহরে তিনি তাঁর গভর্ণমেণ্টের কাজ চালাইতেছিলেন। দক্ষিণ চীনে কোয়াংটান প্রদেশে তাঁর নাম কে না করে! সুতরাং সানইয়াত ভয় পাইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, চাংসোলিন ও উপেইফোর সহিত যুদ্ধঘোষণা করিলে জাপান, আমেরিকা, ইংরেজ, ফরাসী অসন্তুষ্ট হইবে—কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। দেশের হিতের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এ যুদ্ধ ঘোষণায় জাপান, আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স সকলের সহিতই শত্রুতা প্রকাশিত হইল। তিনি জগৎকে

বুঝাইয়া দিলেন যে, বিদেশীয় রাজশক্তি মুখে বাহিরে যতই সাধুতা দেখান না কেন,—অন্তর্বিপ্লবে যাহাতে চীনদেশ নষ্ট হয়—তাহাদের সেই চেষ্টা বড় প্রবল।

যুদ্ধ বাধিয়া গেল। আমেরিকা, জাপান, ব্রিটীশ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্ট পিকিন গভর্ণমেণ্টকে রক্তচক্ষু দেখাইয়া জানাইয়া দিলেন যে, এই যুদ্ধ ব্যাপারে যদি আমাদের কোন প্রকার ক্ষতি হয় তবে তাহার ক্ষতিপূরণ পিকিনের চীনা গভর্ণমেণ্ট বহন করিবেন। চেকিয়াংএর শাসনকর্ত্তা লাউইয়াং সাংঘাই বন্দর ত্যাগ করিলেন না। উপেইফোর প্রেরিত কিয়াংসু প্রদেশের শাসনকর্ত্তা চিসিয়ান লাউইয়াংকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। উপেইফো ক্রমাগত নদীপথে ও রেলপথে পিকিন হইতে চিসিয়ানের সাহায্যার্থ সৈন্য সাংঘাইয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু লাউইয়াংকে কিছুতেই নড়াইতে পারা গেল না। সাংঘাই বন্দরে বিদেশীয় রণপোত সমূহ এই ব্যাপার নিরপেক্ষভাবে দেখিতে লাগিল। উদ্দেশ্য, একবার সুযোগ আসিলে হয়। এদিকে উপেইফোর বন্ধু মাঞ্চুরিয়ার রণদেবতা চাংসোলিন মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিতে লাগিলেন। উপেইফো এ সংবাদে চিন্তিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হইল না। গত ১৯২৪এর ৯ই অক্টোবর তারিখে

সংবাদ পাওয়া গেল যে, চাংসোলিনএর সৈন্যদল উপেইফোকে সানহাইকোয়ান সীমান্তে পরাজিত করিয়া দিয়াছে। উপেইফোর চিহিলি সৈন্যদল পলায়ন করিতেছে, আর কেহ বা পচাংসোলিনের দলে যোগদান করিতেছে। গত ১৩ই অক্টোবর তারিখে খবর আসিল যে, চেকিয়াংএর শাসনকর্ত্তা লাউইয়াংসিয়াং উপেইফোর প্রেরিত সৈন্যদলের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন। চেকিয়াংএর সেনাপতি লুট্‌চুন ও প্রধান কর্ম্মচারী হলএনগিলন জাপানে পলায়ন করিয়াছেন। চেকিয়াং এর শাসনকর্ত্তার সহিত কিয়াংসুর শাসনকর্ত্তার অর্থাৎ উপেইফোর সন্ধি হইয়াছে। অতএব দেখা গেল, উপেইফো উত্তর চীনে চাংসোলিন কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলেন কিন্তু দক্ষিণ চীনে তাঁর সৈন্যদল সাংঘাইএর যুদ্ধে জয়লাভ করিল। কিন্তু সে জয়লাভ বেশীদিন স্থায়ী রহিল না। ১৬ই অক্টোবর জানিতে পারা গেল যে, চেকিয়াং প্রদেশের সৈন্যদলের নেতারা বিপক্ষপক্ষের অর্থাৎ উপেইফোর কিয়াংসু সৈন্যদলের ভিতরে ষড়যন্ত্র স্থাপিত করিয়াছে। চেকিয়াং সৈন্যদল পরাজিত হইয়াও হাল ছাড়িল না, —তাহাদের কূট বুদ্ধিতে কিয়াংসু সৈন্যদল তাহাদের পক্ষে আসিয়া ভিড়িতে লাগিল। এ বিষয়ে চেকিয়াং পক্ষে জেনারেল সুসুই ওস্তাদ লোক। এই ভাবে

জনবলে বৰ্দ্ধিত হইয়া চেকিয়াং সৈন্যদল সাংঘাই এর নিকটে আবার যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছে, ওদিকে জেনারেল চি'র নেতৃত্বে কিয়াংস্থ-সৈন্য তাহাদের আক্রমণ করিতেছে। কিন্তু খাদ্যাভাবে চেকিয়াং সৈন্যদল বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিল। এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া লুঠতরাজ সুরু করিয়া দিল। ওদিকে সানইয়াতসেন নিতান্ত চুপচাপ বসিয়া ছিলেন না। তিনি ক্যান্‌টনের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে উপেইফোর মার্চেন্ট ভলান্টিয়ার সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়া দিলেন। সানের সৈন্যদলের কতকগুলি সৈন্য অবাধ্য হইয়া ক্যাণ্টন্ সহরে আগুণ লাগাইয়া দিল। রাস্তায় ঘাটে নরহত্যা করিতে লাগিল, অবশেষে ইহাদিগকে বন্দী করিবার আদেশ প্রচারিত হইল। ইহাদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল।

এদিকে পিকিনে গণতন্ত্রের সভাপতি সাওকুন নিতান্ত পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া রহিয়াছেন। চারিদিকে এত যুদ্ধবিগ্রহ—অথচ তাঁহার কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। অবশেষে তিনি ইস্তাহার প্রচার করিয়া জানাইলেন যে, "অবিলম্বে এই যুদ্ধবিগ্রহের নিবৃত্তি করিতে হইবে। পিকিনের প্রাসাদের মেয়র উপেইফোকে কর্ম্মচ্যুত করা হইল। তাহাকে সুদূর তিব্বতে কোকোনর নামক হ্রদের

পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমুহের চীফকমিশনার নিযুক্ত করা হইল। চিহিলি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ওয়াংচেংফু সমস্ত সৈন্যদলের ভার গ্রহণ করিবেন। সানহাইকোয়ান নামক স্থানে তিনি সমস্ত সৈন্যদল পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।" এদিকে জাপান গভর্ণমেণ্ট পোর্ট আর্থার হইতে ২৪শে অক্টোবর তারিখে চাইনষ্টিন বন্দরে দুইখানি ডেষ্ট্রয়ার প্রেরণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। সেই দিনই খবর পাওয়া গেল যে, চাংসোলিন এক কমিউনিকে প্রকাশ করিয়াছেন, এখন হইতে পিকিনের প্রধান গভর্ণমেণ্টের সহিত আমার বিবাদ শেষ হইয়াছে; কারণ, উপেইফো আমার সৈন্যদলের নিকট পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট সাওকুন পলায়ন করিয়া পিকিনে বিদেশীয় রাজদূত ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। উপেইফো পলায়ন করিয়াও যুদ্ধের আশা ত্যাগ করেন নাই। তিনি শেষবার শেষ বোঝাপড়া করিবার নিমিত্ত সানহাইকোয়ান্ হইতে চাংসোলিনকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

কিন্তু গত ৩রা নবেম্বর খবর পাওয়া গেল যে, আঞ্জুনামে একটি দল পুনরায় মাথা তুলিয়াছে; তাদের নেতা ফেংগুসিয়ান। তিনি উইপেফোকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া দিয়াছেন। উপেইফো টাকু নামক স্থানে পলায়ন

করিয়াছেন—সম্ভবতঃ সেইস্থান হইতে তিনি দক্ষিণদিকে পলায়ন করিবেন। কিন্তু পলায়ন করিবার পূর্ব্বে উপেইফো জেনারেল চাংফেংলিং এর হস্তে তার সৈন্যদলের ভার প্রদান করিয়া গেলেন। কিন্তু উপেইফো প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই চাসোলিং আঞ্জুদলের নেতৃপ্রবর ফেংগুসিয়ানের সহিত যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

উপেইফোর অনুপস্থিতে তাঁর বিরাট সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইহারা অভাবের তাড়নায় টাইন্‌ট্সিন সহর লুট করিল। আঞ্জুদলের বিজয়ী সেনাপতি ফেংগুসিয়ান ইহাদের বাগ মানাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অতঃপর আর কোন বাধা রহিল না—পিকিন নিষ্কণ্টক হইয়া গেল। প্রেসিডেণ্ট সাওকুন পদত্যাগ করিয়াছেন, মেয়র উপেইফো পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন, আঞ্জুদলের বিজয়ী নেতা ফেংগুসিয়ান পিকিন নগরে প্রবেশ করিলেন। সেদিন ১৯২৪ সালের ৫ই নভেম্বর। মাঞ্চু রাজবংশের পরিবারবর্গ তখনও রাজপ্রাসাদে বাস করিতে-ছিলেন। ফেংগুসিয়ানএর আগমন সংবাদ পাইয়া ভূতপূর্ব্ব বালক সম্রাট সুয়াংটাং রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন। সুয়াংটাং প্রিন্স চুনএর আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের কর্ম্মচারীরা শুধু প্রসাদে রহিল—সম্রাটের

তৈজসপত্রের রক্ষণের জন্য। ফেংগুসিয়ান এর সহিত পরাক্রান্ত আঞ্জুদলের প্রতিপত্তি পুনরায় পিকিন গভর্ণমেণ্টে সংস্থাপিত হইল। ১৯২২ সালে এই দল নেতাহীন হইয়া শক্তিহীন হইয়াছিল। সেই হইতে ইহারা মাথা নীচু করিয়াছিল। রয়টার সংবাদ দিয়াছেন, টুয়ানজিউ নামে এক নবীন কর্ম্মী শীঘ্রই প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিতেছেন। ইনি ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট ইয়ানাসকাইএর অধীনে সেনাপতি ছিলেন।

গত ১৪ই নভেম্বর তারিখে প্রকাশ যে, সানইয়াতসেন সাংঘাই নগরে গমন করিয়াছেন। সেখানে উত্তর চীনের নেতৃগণের সহিত তিনি মিলিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করিবেন। সেই সভায় চাংসোলিন বিজয়ী ফেংগুসিয়ান ও নবীন নেতা টুয়ানজিউ উপস্থিত থাকিবেন। যাহাতে দেশে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা আসে তাহার জন্য ইহারা প্রত্যেকেই চেষ্টা করিবেন।

(১১)

দীর্ঘ ত্রিশবৎসরকাল মাতৃভূমির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সানইয়াতের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। তিনি স্বয়ং ডাক্তার ;—অথচ দেশের কাজের জন্য একদিনের তরে নিজের শরীরের দিকে চাহিয়া দেখেন নাই। ত্রিশ বৎসর যাবৎ স্বদেশে বিদেশে নির্ব্বাসনে পলায়নে কত দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া তিনি আপনার কর্ম্মময় জীবনতরণী বহন করিয়া চলিয়াছেন—কত আশা কত নৈরাশ্যের ভিতর দিয়া এই অপূর্ব্বকর্ম্মার দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছে ; কত দুশ্চিন্তায় কত বিনিদ্র রজনী তিনি যাপন করিয়াছেন—অথচ এক দিনের জন্যও কেহ তাঁহাকে কাতর হইতে দেখে নাই।

কিন্তু গত বৎসর (১৯২৪ সাল) হইতেই তাঁহার শরীরে ব্যধির চিহ্ন প্রকাশিত হইল। বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য তিনি জাপানে গমন করেন; কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। এদিকে দেশের অবস্থা ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া উঠিল - তিনি বিশ্রাম ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। তাঁর জীবনে দুইটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল—একটি স্বদেশকে অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা

করা ও আর একটি স্বদেশকে শান্তিময় শাসনে আনিয়া তাহার উন্নতি বিধান করা। জীবনভরা পরিশ্রম করিয়া যদিও বা তিনি দেশকে মুক্ত করিলেন—কিন্তু দেশের অভ্যন্তরিক শান্তি বিধানের বৃথা প্রয়াস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁহাকে পিকিন সহরে একটা বিশেষ অভ্যর্থনা করা হয়। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অবশেষে অস্ত্রোপচার করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিলে বিশিষ্ট চীন ডাক্তারেরা তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করিলেন। সমস্ত জগৎ তাঁহার সংবাদের জন্য এই সময় প্রতীক্ষা করিত। অস্ত্রোপচার করা হইলে তিনি কিছুদিনের জন্য সুস্থ হন। পিকিনের বহির্ভাগে শিশাম নামক গ্রীষ্মাবাসে অতঃপর তিনি বাস করিতে লাগিলেন।

সানইয়াতের চিন্তাধারা ও কাজ যে শুধু তাঁহার স্বদেশ চীনে আবদ্ধ ছিল এমন নহে। তিনি সমস্ত এসিয়ার মধ্যে একতাস্থাপন করিয়া এক বৃহত্তর সাম্রাজ্যের কল্পনা করিয়াছিলেন। এসিয়া জগতের সর্ব্ব সভ্যতার জন্মস্থান-স্বরূপ। এসিয়ার ভাব ভাষা ধর্ম্ম লইয়াই আজ পাশ্চাত্য জগৎ এত উন্নত। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য জাতি আজ প্রাচ্য জগৎকে পদদলিত করিয়া ক্রীতদাসের ন্যায়

ব্যবহার করিতেছে। এসিয়ার এই অপমান সানের উদার অন্তঃকরণে বড়ই বাজিয়াছিল। এসিয়ার নষ্ট গৌরব উদ্ধারের জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন। তাই তিনি অতি দুঃখে একবার বলিয়াছিলেন,—"এসিয়ার যে রাজ্যের দিকে চাহিয়া দেখি, সেখানেই দেখিতে পাই ইউরোপ ও আমেরিকার কোন না কোন জাতি তাহার কিছু না কিছু অধিকার করিয়া রহিয়াছে।"

সানইয়াৎ ভারতকে বড় ভালবাসিতেন। সর্ব্বদাই ভারতের কথা তাঁর মুখে লাগিয়া থাকিত। ভারতের এই অবনতির জন্য তিনি অন্তরে অন্তরে কষ্ট পাইতেন। একদিন কোন এক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট তিনি বলিয়াছিলেন,—"ভারতের এই দুর্দ্দিনে—ভারতবাসী বোঝে না, তাই তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করে! এইরূপে যত বেশী বিবাদ তাঁহাদের মধ্যে উদ্ভূত হইবে—ততই তাহাদের শাসনকারীদের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইবে—ততই ভারতের জাতীয়তা অপমানিত হইতে থাকিবে। সান ইয়াৎ মহাত্মা গান্ধীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। মহাত্মার কর্ম্মধারা তাঁহাকে মোহিত করিয়াছিল। কিন্তু রাজনৈতিক মত হিসাবে তিনি সকল বিষয়ে একমত ছিলেন না—তাই তিনি বলিতেন,—"ব্রিটিশ জাতি বড় সহজ নহে—আজ

ভারতবাসী যে রকম ভাবে, নিজের দোষে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে অতি সত্ত্বর যে নিজেদের কোন উন্নতি করিতে পরিবে এমন আশা নাই।"

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন তুর্কীজাতি নবীনমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গ্রীসের পরাজয় সাধন করিল, যখন তুর্কগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল—তখন সানের আনন্দ দেখে কে! তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে একদিন হয়ত তুর্কী জাপানের হাত ধরিয়া এসিয়ার রঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া এসিয়ার দুঃখ কালিমা মোচন করিবে। কিন্তু সানের আশা পূর্ণ হইল না। সহসা তাঁহার ব্যাধি বাড়িয়া গেল। রয়টার জগৎ জুড়িয়া খবর পাঠাইল—সানইয়াতসেন মারা গিয়াছেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই সে সংবাদ ভ্রান্ত বলিয়া স্থিরকৃত হইল। ইহার পরে ১২ই মার্চ্চ (১৯২৫ সাল) তারিখে সঠিক খবর আসিল—সানইয়াৎসেন চিরজন্মের মত বিদায় লইয়াছেন। দেশের কাজ, এসিয়ার কাজ, জগতের কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া কর্ম্মবীর সান অকালে চলিয়া গেলেন।

সানের এই আকস্মিক তিরোধানে চীন জাতির যতখানি ক্ষতি হইল এমন আর কাহারো নহে। সানের বড় সাধ ছিল—চীনের আভ্যন্তরিক শান্তির প্রতিষ্ঠা দেখিয়া যান,—

কিন্তু তাঁর নিজের হাতের গড়া,—তাঁর চিরজীবনের সাধনা চীনগণতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা তাঁহাকে দর্শন করিতে না দিয়া ভগবান তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন। সান এতদিন নিজের পক্ষপুট বিস্তার করিয়া চীন দেশকে বিদেশীয়ের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন,—কিন্তু আজ আর সান নাই,—আজ চীনজাতিকে জগতের লোলুপ দৃষ্টি হইতে কে রক্ষা করিবে; উত্তাল তরঙ্গময় বিপ্লব সাগর হইতে আনিয়া মাতৃভূমিকে শান্তি নিকেতনে বসাইয়া এইরূপে আর কোন্ কর্ম্মবীর দেহপ্রাণমন সমর্পণ করিয়া নীরবে মায়ের সাধনা করিবে?